জনশিক্ষা সংস্করণ গ্রন্থমালা—১

অধ্যয়ন ও সাধনা

আচার্য্য

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়

বরদা এজেন্সী,

কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা

॥০

প্রকাশক
শ্রীশিশিরকুমার নিয়োগী, এম-এ, বি-এল,
বরদা এজেন্সী
কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা।

ডাঃ ফণীন্দ্রনাথ বসু, এম-এ, পি-এইচ্-ডি প্রণীত

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র (জীবনী)···১।০

আচার্য্য জগদীশচন্দ্র (,,)···১॥০

প্রিণ্টার—
শ্রীমিহিরচন্দ্র ঘোষ
নিউ সরস্বতী প্রেস
২৫।এ, মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

দাম আট আনা। কার্ত্তিক, ১৩৪০

অধ্যয়ন ও সাধনা

পাঠাগার ও প্রকৃত শিক্ষা

এমার্সন বলেন "গোলাপ বাগান কার ?—আমার; আমার দেখে সুখ, চোখের তৃপ্তি, হৃদয়ের আনন্দ ! বাগানের মালিক বেড়া বাঁধান, মালি রাখেন, জল সেচন করেন ; সে অনেক কাণ্ড। কিন্তু অমন শোভা কাহারও একার নয়।" কারণ, গোলাপের সার্থকতা ফুটে, সৌন্দর্য্যের বিকাশ ক'রে। আর সে সৌন্দর্য্য দর্শকমাত্রেই উপভোগ করতে পারেন।—কথাটি পাঠাগার সম্বন্ধেও সত্য। পাঠাগারের যাঁরা উদ্যোগী তাঁরা পয়সার যোগাড় করবেন, জমি কিনবেন, ঘর তুলবেন ; তারপর উৎকৃষ্ট পুস্তকরাশি সংগ্রহ ক'রে জনসাধারণের হাতের কাছে এনে দেবেন। সে পুস্তকের অধিকার কারো একার নয়। পাঠকমাত্রেই তার সৌন্দর্য্য-রস উপভোগ করতে পারবেন। এই গ্রন্থশালা জ্ঞানলিপ্সুদের বড় আদরের জিনিস।

জ্ঞানের অনুশীলন আমি ক'রে থাকি। আমি আজীবন ছাত্রভাবে আছি। আমার শৈশব, কৈশোর, যৌবন কখন চ'লে গেছে বুঝ্‌তে পারি নি। আজ বার্দ্ধক্যে পা দিয়ে আমি সেই ছাত্রই আছি। আমি দিনের মধ্যে দু ঘণ্টা নিভৃতে ভাল পুস্তককে সঙ্গী ক'রে কাটিয়ে দি,—দিন সার্থক হয়। জগতে যা কিছু সৎচিন্তা, উৎকৃষ্ট ভাব আছে, যা কিছু উদ্দীপনা সৃষ্টি করে এবং মানুষের হৃদয়ে প্রেরণা দেয়, তার সবই পুস্তকে নিহিত। উপনিষদ্ ও ষড়্‌দর্শনের তত্ত্ব, গ্রীস্‌-দেশের সোক্রেটীস্, প্লেটো ও আরিষ্টটল্‌ প্রভৃতি মহানু-ভবগণের চিন্তারাশি, এবং পৃথিবীর অন্যান্য স্থানে যে মনীষিগণ জন্মগ্রহণ করেছেন তাঁদের বাণী,—সকলই পুস্তকের মধ্যে। তাঁরা যা দিয়ে গেছেন তা অমূল্য সামগ্রী। আমরা সকলেই উত্তরাধিকারসূত্রে তার অধিকারী। যিনি ধনী তিনি স্ত্রীপরিবারকে সুখে রাখেন, তাঁর ব্যক্তিগত রোজগার ছেলে, নাতি, বড়জোর আত্মীয়স্বজনে খায়। তিনি গহনা গড়ান, কোম্পানীর কাগজ করেন, জমীদারী কেনেন, আর পাটা কবুলত লেখেন। তাঁর জিনিস ঘরের বাইরে যায় না। কিন্তু ভাব ও চিন্তাজগতের কথা স্বতন্ত্র। প্রতিভাশালী ব্যক্তি ভাব-সমুদ্র মন্থন ক'রে যে রত্ন

আহরণ করেন তা'তে সকলের সমান অধিকার। ইংলণ্ড, আমেরিকা, জার্ম্মানী প্রভৃতি দেশের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলি সকলের সাধারণ সম্পত্তি। তাই গ্রন্থকার ও বৈজ্ঞানিকগণ মহামান্য, জগতকে তাঁরা মহাঋণপাশে আবদ্ধ ক'রে রেখে যান।

এদেশে লাইব্রেরীর উন্মেষমাত্র হচ্ছে! আমাদের মুস্কিল এই যে পাঠ্যপুস্তক ছাড়া আর কিছু বড় কেউ পড়্তে চায় না। তাই বলি, আমাদের কপাল পুড়ে গেছে। ইংরাজী শিক্ষার প্রবর্ত্তনের সূচনা থেকে ছাত্র-গণের একমাত্র চিন্তা হ'য়ে উঠেছে—কি ক'রে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের একটি উপাধি নেব। তারপর উকীল, ডাক্তার, মাষ্টার, কেরাণী,—এ ছাড়িয়ে যাবার আর যোগ্যতা নেই; কেবল দাসত্ব আর গতানুগতিকে গা ঢালা। স্বাধীন জীবিকা ব'লে যে একটা কথা আছে শিক্ষিতদের সে ধারণা নেই। পোষ্ট আফিসের ছাপের মত তাঁরা ইউনিভারসিটির ছাপটাকেই সার বুঝেচেন। যা হোক, এখন সুবাতাস বয়েছে, সময় এসেছে। তাই ধীরে ধীরে পাঠাগারের আদর বাড়্ছে।

আমেরিকায় ৪৮টি ষ্টেট্ আছে। প্রত্যেক ষ্টেটে একটি বা কোনটিতে দুটি ক'রে বিশ্ববিদ্যালয়, তা ছাড়া আবার প্রাইভেট্ ইউনিভারসিটিও আছে। জাপানেও

তাই,—শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা অনেক। জ্ঞানের মহিমা হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছে ব'লেই তারা নিজের দেশে দরিদ্র জনসাধারণের হিতার্থে জ্ঞানের পথ উন্মুক্ত ক'রে দিচ্ছে। বাতাস, জল যেমন বিনা মাশুলে মেলে, ঐ সব দেশে তেম্নি সৎপুস্তকরাশিও দরিদ্রের অনায়াসলভ্য সম্পত্তি হচ্ছে। সকলেই তা বিনামাশুলে পাচ্ছে, তার জন্যে ব্যয় করতে হচ্ছে না। সেখানে ধনীরা বলেন—দরিদ্রের গৃহে শিক্ষার পথ পরিষ্কারের সূচনামাত্র এখানে হয়েছে; লাইব্রেরী এই সূচনার প্রধান লক্ষণ। ঐ সব দেশে জ্ঞানপিপাসা অত্যন্ত বলবতী। কিন্তু আমাদের জ্ঞানপিপাসা এখনও হয় নি। পরীক্ষা পাশই আমাদের বরাবর সন্ধান ছিল। তাই দেখতে পাওয়া যায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্ষ্ট ক্লাস (First Class) এম-এ পাশ ক'রেও কেউ রিসার্চের (Research) দিকে ঘেঁসে না। কারণ, তা'তে বিপুল উদ্যম ও ধৈর্য্য চাই, দিনের পর দিন একটানা খাটুনি চাই। কিন্তু সে উৎসাহ কোথায়? তাই বলি, প্রায় কোনো গভীর চিন্তা-প্রসূত ফল হয় নি এই লেখাপড়ায়; এই বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষায়, পৃথিবীর সামনে দাখিল করা যায় এমন কিছু অল্পই আছে।

আপনারা কার্ণেগীর নাম শুনেচেন। তিনি

স্কট্‌লণ্ডের লোক। ছেলেবেলায় খবরের কাগজ বিলি কর্‌তেন। তারপর নিজের উত্তমের বলে আমেরিকার পিট্‌স্‌বার্গে পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লোহার কারখানার মালিক হয়েছিলেন। ৯০ কোটি টাকা দিয়ে একজন নয়—একদল লোক মিলে তাঁর কারখানা কিন্‌লে। তিনি টাকা নিয়ে স্কট্‌লণ্ডে ফিরে এলেন। তাঁর আয় বছরে ৪ কোটি টাকা হবে, অর্থাৎ সমগ্র বাংলাদেশ থেকে গবর্ণমেণ্ট রাজস্ব হিসাবে যত টাকা পান প্রায় তাই। দেশে ফিরে এসে তিনি গ্ল্যাস্‌গো, ডণ্ডী প্রভৃতি বড় বড় সহরে Workingmen's Institute অর্থাৎ শ্রমজীবীদের জন্যে বড় বড় বিত্তামন্দির ও গ্রন্থশালা খুলে দিলেন। সমস্ত দিন কলকারখানায় খেটে সন্ধ্যার পর তারা এইসব পাঠাগারে নানারকমের বই, খবরের কাগজ প্রভৃতি পাঠ করে। সেখানে তারা চা, কাফি খায়,—মদ নয়; ইংলণ্ড ও আমেরিকায় মদের বিষময় ফল ফলে। শ্রমজীবীদের পাঠাগারের জন্যে কার্ণেগী অনেক বড় সহরে সাড়ে সাত লক্ষ ক'রে টাকা দিয়েছেন। ইংলণ্ড, আমেরিকা, জাপান প্রভৃতি দেশে এ রকম পাঠাগার স্থাপিত হ'তে আরম্ভ হয়েছে। সে সব দেশে মুটে, মজুর, গাড়োয়ান কাগজ পড়্‌ছে, রাজনীতি আলোচনা ক'র্‌ছে। যারা মাটীর নীচে খনিতে কাজ

করে তারাও কাগজ পড়ে। চাকরাণী মেথরাণীও দেশের খবর রাখে। জাপানেও তাই। রবিবাবু বল্লেন, জাপানে তাঁর বাসার দাসী তাঁর গীতাঞ্জলির খবর রাখে। দেখুন এই সব জায়গায় জ্ঞানস্পৃহা কত বলবতী। আর আমাদের দেশের দিকে চেয়ে দেখুন। যে বই কেনে সে পড়ে না, আর যার পড়্‌বার ইচ্ছে আছে তার কেন্‌বার পয়সা জোটে না। তারপর বই চেয়ে নিয়ে গিয়ে ফেরত দেয় না—ওজর দেখায় অমুক নিয়ে গেছে। এই রকমে দিন কতক কাটিয়ে দিয়ে শেষে বইখানার অস্তিত্ব বিলোপ ক'রে দেয়। এই রকম জঘন্য আচরণে লাইব্রেরী উজাড় হ'য়ে গেছে শুনেছি।

বাঙ্গালী গয়না গড়াবে, চাঁদনীতে নানা ফ্যাসানের কাপড় কিনবে, নানা রকম বিলাসে পয়সা নষ্ট করবে, কিন্তু পুস্তকে নয়। মান্দ্রাজে দেশীয় লোকের খুব বড় পুস্তকের দোকান আছে। উদাহরণ স্বরূপ—গণেশ কোম্পানী ও নটেশন্ কোম্পানীর নাম করা যেতে পারে। নটেশন্ মোটর চড়েন। প্রথম দেখে মনে হয়েছিল, বইএর দোকান ক'রে মোটর হাঁকাচ্ছেন অর্থাৎ পৈতৃক সম্পত্তির অপচয় করছেন। কিন্তু তা ত নয়—এর পিছনে মান্দ্রাজীদের জ্ঞানের আদর ও পাঠের তৃষ্ণা বর্ত্তমান। তাই তিনি নিজের রোজগারেই মোটর

কিনেছেন। আমাদের বাংলাদেশে Text book ছাত্রপাঠ্য বই না ছাপালে দোকান উঠে যায়; কিন্তু নটেশন্ Text book বা ছাত্রপাঠ্য বই ছাপান্ না। তাঁরা বাংলা তথা ভারতবর্ষের চিন্তাশীল পণ্ডিতগণের বক্তৃতা ছাপান্; রাজনীতি, সমাজতত্ত্ব, মনস্বিগণের সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রভৃতি নানাপ্রকারের পুস্তক প্রকাশিত করেন। এই কাজে ব্যবসায়ী যে শুধু লাভবান হন্ তা নয়, সৎপুস্তক প্রকাশ ক'রে দেশের একটা অভাবও দূর করেন। তাই বল্‌তে হয়, সেখানে জ্ঞানতৃষ্ণা বেশী। কলিকাতার বড় পুস্তকবিক্রেতাকে জিজ্ঞাসা ক'রে জানা যায়, "People's Library" প্রভৃতি সংস্করণের অল্প মূল্যের বই মান্দ্রাজীরা বেশী কেনেন, বাঙ্গালী বড় একটা কেনেন না। বাংলাদেশে 'টেক্‌ষ্ট বুক কমিটি'র—অনুমোদিত পাঠ্যপুস্তক না হ'লে আর বই উদ্ধারের উপায় নেই। এখানে রসায়ন সম্বন্ধে ক্ষুদ্র পুস্তকের আদর হয় না। কারণ, তার জন্যে "ল্যাবোরেটরী" চাই। কিন্তু ছেলেদের চিড়িয়াখানায় নিয়ে গেলে জীবজন্তু সম্বন্ধে কৌতুহল হ'তে পারে এই ভেবে একখানা ছোট "প্রাণীবিজ্ঞান" লিখেছিলাম। কিন্তু বইখানা কয়েক বৎসর পড়ে রইলো, কাট্‌তি হ'লো না। কিছুকাল পরে জানি না কেন, সেখানা 'টেক্‌ষ্ট বুক কমিটি'র

অনুমোদিত হ'য়ে গেল। একজন ইন্স্‌পেক্‌টার পূর্ব্ব-বাংলার একটা অঞ্চলের জন্য সেখানা পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্দ্দিষ্ট ক'রে দিলেন; ব্যস্‌, এক নিশ্বাসে সব বই বিক্রী হয়ে গেল।

বিজ্ঞান কলেজের জন্য স্যর তারকনাথ ও স্যর রাসবিহারী পঁচিশ লক্ষ টাকা দিয়েছেন। দুটি ল্যাবোরেটরীর প্রত্যেকটিতে ২০ জন ছাত্রের জন্য বছরে ৫০ হাজার টাকা খরচ করা হয়, অর্থাৎ মাথাপিছু ২০০০৲ টাকার উপর ব্যয় হচ্ছে। তবু কি ব্যাপার! প্রকৃত জ্ঞানান্বেষী ক'জন পাই? অনেক সময় কাঁদ্‌তে হয়। এখন ক্রমশঃ হাওয়া ফির্‌ছে। তবে কোকিল একবার ডাক্‌লেই যে বসন্ত সমাগত হয় এমন ভাব্‌লে চলে না। সে বসন্তের অগ্রদূত মাত্র। লণ্ডন, প্যারী প্রভৃতি স্থানের Chemical Journalএ—অর্থাৎ রসায়নসম্বন্ধীয় সাময়িক পত্রিকায় প্রত্যেক বারে বর্ণমালা অনুসারে হাজার দু-হাজার রাসায়নিকের নাম থাকে। তার অন্ততঃ ৫০০ জন রসায়ন সম্বন্ধে মৌলিক গবেষণা করেন। জার্ম্মানীতে ৫০০০, ইংলণ্ড আমেরিকায় কয়েক হাজার, এবং সমস্ত য়ুরোপে অন্ততঃ ১০,০০০ রাসায়নিক প্রতিদিন মৌলিক গবেষণা করেন। আর আমরা? এই কবির কথায় বিংশতি কোটী—এখন

ত্রিশ কোটি মানুষ, আমরা কি করছি? আমাদের গর্ব্বের কিছু নেই। আমায় সভাপতি হবার জন্য টানাটানি করেন; আজ সমাজ সংস্কারের আলোচনা, কাল পাটেল বিল; কিন্তু এক মুর্গী কবার জবাই হয়? অন্ততঃ ত্রিশ কোটির মধ্যে ত্রিশ জন রাসায়নিক (chemist) হোক, তবে ত নিষ্কৃতি; নইলে বিশ্রাম কোথায়? শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় লণ্ডনে পাঠাগারের প্রচলন দেখে অবাক্ হয়েছিলেন—

"আমি গিয়া দেখিলাম, শিক্ষিত দেশহিতৈষী ব্যক্তি-দিগের মনে নিম্নশ্রেণীর মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের উৎসাহ অতিশয় প্রবল। তাহার ফলস্বরূপ ঐ শ্রেণীর মানুষের মনে জ্ঞানস্পৃহা দিন দিন বাড়িতেছে এবং তাহাদের ব্যবহারের জন্য চারিদিকে অসংখ্য ছোট ছোট পুস্তকালয় স্থাপিত হইয়াছে। প্রায় প্রত্যেক রাজপথে দুই-দশখানি বাড়ীর পরেই একটি ক্ষুদ্র পুস্তকালয়। নিম্নশ্রেণীর মানুষেরা সেখানে নামমাত্র কিছু পয়সা জমা দিয়া সপ্তাহে সপ্তাহে বই লইয়া যাইতেছে ও ঘরে গিয়া বসিয়া পড়িয়া সে পুস্তক আবার ফিরাইয়া দিতেছে। ইহার অনেক পুস্তকালয় দোকান-ঘরের মধ্যে। দোকানদার অপরাপর জিনিসের ব্যবসা করিতেছে, সেই সঙ্গে একপাশে একটি পুস্তকালয় রাখিয়াও কিছু উপার্জ্জন

করিতেছে। ইহা ভিন্ন স্বল্পমূল্যে বিক্রেয় ব্যবহৃত পুস্তকের দোকান অগণ্য। এইরূপ একটি পুস্তকালয়-বিশিষ্ট দোকানে গিয়া একদিন যাহা দেখিলাম ও শুনিলাম তাহা মনে রহিয়াছে। আমি দোকানে অন্য কাজে গিয়া দেখি, একপার্শ্বে দুইটি আল্‌মারিতে কতক-গুলি পুস্তক রহিয়াছে। মনে করিলাম পুস্তকগুলি স্বল্পমূল্যের ব্যবহৃত পুস্তক। জিজ্ঞাসা করিলাম—এ-সব পুস্তক কি বিক্রয়ের জন্য?

উত্তর—না, এটা সার্কুলেটিং লাইব্রেরী।

আমি—এসব পুস্তক কারা লয়?

উত্তর—এই পাড়ার নিম্নশ্রেণীর লোকেরা।

আমি—আমি কি বই লইতে পারি?

উত্তর—হাঁ পারেন, এ ত সাধারণের জন্য।

তারপর আমি একখানি ৬।৭ টাকা দামের বই লইয়া দুই আনা পয়সা জমা দিয়া ও আমার নাম ও বাড়ীর ঠিকানা লিখিয়া রাখিয়া আসিলাম। আবার সপ্তাহান্তে বই ফেরৎ দিয়া আবার দুই আনা দিয়া আর-একখানি বই লইয়া আসিলাম। এইরূপ তিন-চারি সপ্তাহের পর একদিন গিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, 'এ ব্যবসা তোমরা কতদিন চালাইতেছ?'

উত্তর—গত ৮।৯ বৎসর।

আমি—মধ্যে মধ্যে তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হও না ?

উত্তর—কিরূপে ?

আমি—লণ্ডনের মত বড় সহরে মানুষ এক পাড়া হতে আর-এক পাড়ায় উঠে গেলে খুঁজে পাওয়া ভার। মনে কর যদি বই ফিরে না দিয়ে এ পাড়া হতে উঠে যায়, তা হলে বই কি করে পাবে ?

এই প্রশ্নে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া তাহারা বলিল, "তা কি করে হতে পারে ? এ যে আমাদের বই ? তাকে উঠে যাবার সময় ফিরে দিতেই হবে।"

আমি—মনে কর যদি না দেয় !

তাহারা হাসিয়া কহিল, "সে হতেই পারে না।" বই না দিয়া যে কেহ চলিয়া যাইতে পারে, ইহা যেন তাহাদের ধারণাই হয় না।"

—"আত্মচরিত"—৩৫৬-৫৭ পৃঃ।

আপনারা হাজারখানা বই নিয়ে লাইব্রেরী করুন, মাসিক চাঁদা দু আনা। দেখ্‌বেন মাসে মাসে অনেক বই ফাঁক হ'য়ে যাবে।

জগতে দেখা যায় যাঁরা প্রকৃত বিদ্যাভ্যাস করেছেন তাঁরা অনেকেই Self-taught অর্থাৎ নিজের চেষ্টায় শিখেছেন। ডাক্তার জন্‌সনের মত বিদ্বান বিরল।

তাঁর অবস্থা ভাল ছিল না, কিন্তু তাঁর পিতার পুস্তকের দোকান ছিল। তিনি পাঠাগার থেকে কোনো বই নিতেন আর একটি উচ্চস্থানে ব'সে একমনে পড়্‌তেন। এইরূপ চেষ্টায় তিনি অগাধ পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করে-ছিলেন। নব্য বাংলার অভ্যুদয়ের প্রধান উৎস রাজা রামমোহন রায়, রংপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট ডিগ্‌বি সাহেবের কাছে ইংরেজী পড়্‌তে আরম্ভ করেন, আর্‌বী পার্শী শিক্ষার অনেক পরে। কিন্তু অল্প দিনে এমন ব্যুৎপত্তি লাভ করেন যে ইংরেজী-নবীশরা অবাক্। দেশে কাশী, নবদ্বীপ প্রভৃতি স্থানে অনেক টোল ছিল। তাই সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে তীব্র আপত্তি ক'রে তিনি একখানা চিঠি লেখেন। বিশপ্‌ হিবার সেই চিঠি তদানীন্তন গভর্ণর জেনারেল লর্ড আমহার্ষ্টকে দেন। সে চিঠির ইংরেজী রচনা এত উৎকৃষ্ট হয়েছিল যে তাঁর মৃত্যুর পর সেটি প্রকাশিত হয়,—এশিয়াবাসীর লিখিত ব'লে তার উল্লেখ ক'রে বিশপ হিবার বলেছিলেন "Real curiosity" অর্থাৎ বিস্ময়ের বস্তু। তাই বলি যাঁরা প্রতিভাশালী তাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ধার ধারেন না—নিজের শিক্ষার ভার তাঁরা নিজের উপরেই রাখেন। যদি বল Dr. Ray, D. Sc. তবে বুঝ্‌তে হয় এই যে তাঁর ১৮৮৫ বা ৮৭ সালের ডিগ্রীর কথা

হচ্ছে। তারপর ৩৫ বৎসর ধ'রে তিনি রসায়ন বা অন্য কোনো শাস্ত্র সম্বন্ধে যে গবেষণা করলেন, D. Sc. বল্‌লে সেটা ত স্বীকার করা হয় না। সুতরাং ডিগ্রীটা কিছু নয়,—ওটা অনেক সময় অজ্ঞতার আবরণ মাত্র। অনেকে অমুক সালে দর্শনশাস্ত্রে পরীক্ষা দিয়ে সুবর্ণ পদক পেয়েছি ব'লে গর্ব্ব করেন ; এদিকে হয় ত পরীক্ষার পর পড়া ছেড়েছেন ব'লে হ্যামিল্টন ও রীডের মত ছাড়া নূতন দার্শনিক তত্ত্বের খোঁজ রাখেন না। অনেক ডাক্তার-বাবু ১৮৭২ সালের অর্জ্জিত জ্ঞান অনুসারে রোগীর প্রেসক্রিপ্‌সন্ লেখেন। সে কালের মতের খণ্ডন হয়ে কত নূতন মত প্রচলিত হয়েছে তার খবরই রাখেন না। আলোচনা না করলে অজ্ঞতা এইরূপই দাঁড়ায়। কিন্তু ইংলণ্ড আমেরিকায় লোকে এত ডিগ্রী চায় না। তারা চায় প্রকৃত শিক্ষা।

আমাদের দেশে একে ত লাইব্রেরীর অভাব, তারপর লাইব্রেরী যেখানে আছে সেখানে পাঠকের অভাব। সাময়িক পত্রে এখন চুট্‌কী গল্পই বেশী। এতে পাঠকের রুচি বিকৃত হ'য়ে যায়। তাঁরা আর কঠিন ভাবপূর্ণ বিষয় পড়্‌তে পারেন না, ঐ চানাচুর, সাড়ে আঠার ভাজাতেই মস্‌গুল্ হ'য়ে থাকেন। কিন্তু চাই ভাল জিনিস। উৎকৃষ্ট বিষয়ের অনুশীলন করতে লোকের যাতে প্রবৃত্তি

ও রুচি জন্মে—তারই বন্দোবস্ত কর্‌বার জন্যে আমাদের সচেষ্ট থাক্‌তে হবে। লাইব্রেরীর যাঁরা প্রতিষ্ঠাতা, এই কার্য্যের ভার তাঁদেরই উপর বিশেষ ভাবে ন্যস্ত রয়েছে। আমার ধারণা পাঠাগারে নভেল যত কম থাকে ততই ভাল। উপন্যাস পাঠের সার্থকতা আছে, এ কথা আমি কখনও অস্বীকার করি না। স্কট, ডিকেন্স, অথবা বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র প্রভৃতি প্রতিভাশালী লেখকগণের উপন্যাসে অনেক বিচিত্র চরিত্র চিত্রিত হয়েছে। কিন্তু বাঙ্গালী পাঠকসাধারণের মধ্যে ভাবুকতা ও রসগ্রাহিতার অত্যন্ত অভাব। তাঁরা উপন্যাস পাঠে গল্পাংশের অতিরিক্ত কিছু গ্রহণ কর্‌তে পারেন না। আর সেই কারণেই গভীর ভাবাত্মক কোন বিষয় তাঁদের ভাল লাগে না। লাইব্রেরীতে নানা বিষয়ক উৎকৃষ্ট পুস্তক থাকা চাই; যেমন মহাপুরুষগণের জীবনী, ভ্রমণকাহিনী, ভুগোল, ইতিহাস, ভাবুক লেখকগণের সমাজ শিক্ষানীতি সম্বন্ধীয় প্রবন্ধাবলী, কাব্যগ্রন্থ এবং অন্যান্য আবশ্যকীয় পুস্তক। আর থাকা চাই সারগর্ভ প্রবন্ধে পূর্ণ সাময়িক। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে আজকালকার সাময়িক পত্রিকাগুলি নিতান্ত মামুলি ধরণের হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। রাজেন্দ্রলাল মিত্রের "বিবিধার্থ সংগ্রহ" বা অক্ষয়কুমারের "তত্ত্ববোধিনী"

অথবা বঙ্কিমের "বঙ্গদর্শনের" মত সাময়িক পত্রিকা আর ত দেখি না। নূতনের মধ্যে এই মাসের "প্রবাসী"তে "মেঘদূতের পক্ষিতত্ত্ব" নামক উপাদেয় প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু ইংরেজী সাময়িক পত্রিকা থেকে লোকে Aeroplane বা উড়ো-জাহাজের ও arctic exploration বা মেরু সন্ধানের খবরও পায়। আর দুঃখ এই, আমাদের বিদ্যালয়েও কেউ ভাল ক'রে এর খোঁজ নেয় না।

"ছাত্রানাং অধ্যয়নং তপঃ," কথাটা আমি প্রায়ই ব'লে থাকি। আমার দাঁত পড়ে যাচ্ছে, কিন্তু সে কথাটা আমি বুঝ্‌তে পারি শুধু খাবার সময়, উৎসাহের সময় কখনও নয়। যুবকেরা আমার সঙ্গে কাজে পাল্লা দিতে পারে না। আমি ৯টা থেকে ৪টা পর্য্যন্ত ল্যাবোরেটারীতে খাটি। আমি তাদের সমকক্ষ, জুড়িদার। কিন্তু মুস্কিল ত এইখানে। যাঁরা অন্বেষণের জন্যে ১০০৲ টাকা বৃত্তি পাচ্ছেন—এদেশে এক-শ' অর্থাৎ ইংলণ্ডে পাঁচ-শ'—প্রথম বয়সে নবীন উৎসাহে তাঁদের ত আরও বেশী পরিশ্রম করা উচিত। আর যে ছাত্রদের প্রত্যেকের জন্যে সায়ান্স কলেজে বার্ষিক দু'হাজার টাকার বেশী ব্যয় করা হয় তাঁরাই বা কি করেন? বিশেষ ভাবে বিজ্ঞান অনুশীলন কর্‌বার

উৎসাহ ও যোগ্যতা অনেকের মধ্যে ত দেখ্তে পাই না; দু-একটির মধ্যে কদাচিৎ পাওয়া যায়।

কিন্তু যাঁরা বিশেষ অনুশীলনে ব্যস্ত অর্থাৎ যাঁরা বিশেষজ্ঞ হচ্ছেন তাঁদের দেখে সময় সময় আমার ভয় হয়। ঘোড়া যেমন চলে তাঁরা নিজের বুদ্ধিটাকে ঠিক তেমনি একরোকে চালান, দুনিয়ার আর কোন দিকে চেয়ে দেখেন না। চর্ম্মকারের কাছে যেমন Nothing like leather—অর্থাৎ দুনিয়ায় চামড়াই সারবস্তু, ময়রার কাছে যেমন ঘি আর চিনি, বিশেষজ্ঞের নিকট তেম্নি তাঁর Special subject, বিশেষ বিষয়টি—Vibration of the Violin string, বেহালার তাঁতের অনুরণন বা অন্য কিছু। (সভায় সায়ান্স কলেজের অন্যতম অধ্যাপক মিঃ রমণ উপস্থিত ছিলেন)। আমার এক ছাত্র আছেন; তাঁর খ্যাতি য়ুরোপে পোঁছেচে। তিনি একজন এই রকম বিশেষজ্ঞ, একজন D. Sc.। একদিন ছাত্রপরিবেষ্টিত হ'য়ে ব'সে তাঁকে বল্লাম, "আমার ত বয়স হ'ল। B. C. P. W. অর্থাৎ বেঙ্গল কেমিক্যাল আমার মেয়ে আর ছাত্রেরা আমার ছেলে। এখন বুড়া বয়সে দেখ্চি আমার King Lear রাজা লীয়ারের দশা হবে। কেউ কর্ডেলিয়া হবেন, কেউ গনেরিল, আবার কেউ

বা রেগান।” ছাত্র ত শুনে অবাক্—বল্লেন, “তারা কে?” ছুনিয়ার সব রসে বঞ্চিত হয়ে এ রকম রসায়ন-রসিক হওয়া ত বড় মুস্কিল। আর বিশ্ববিদ্যালয় এর জন্যে বড় কম দায়ী নয়। কুক্ষণে ম্যাট্রিকুলেশনের পাঠ্যতালিকা থেকে ভূগোল নির্ব্বাসিত হয়েছে। পরীক্ষায় কাজে লাগ্‌বে না, সুতরাং আমাদের ছুলাল্‌রা আর ভূগোল পড়্‌বেন না, কে যেন মাথার দিব্যি দিয়েছে। ম্যাপ (Map) টাঙ্গান রয়েছে: পাশ-করা ছেলেকে জিজ্ঞাসা কর্‌লাম, “বার্লিন কোথায়?” সে ইংলণ্ডের দিকে চেয়ে রইলো। আমার একজন সহাধ্যাপক, তিনি M.Sc.-তে Figure of the Earth—অর্থাৎ পৃথিবীর আকৃতি বিষয়ে গণিতশাস্ত্রমূলক বিষয়ে অধ্যাপনা করেন। তাঁর ছাত্রদের মধ্যে কয়েকজন ভূগোলে সম্পূর্ণ অজ্ঞ—তারা পৃথিবীর আকার নির্দ্ধারণ কর্‌তে এসেছে, কিন্তু ভূতলের উপরে কি কি প্রসিদ্ধ দেশ, নগর বা সমুদ্র আছে সে বিষয়ে তাদের কোনও ধারণাই নেই। তারপর কন্‌স্‌টান্টিনোপল্ দেখাতে বলায় ম্যাপের উপর অন্ধের মত হাতড়াতে লাগ্‌লো। ইংলণ্ডে কিন্তু এমন হয় না। সেখানে ছেলেরা ভূগোল, প্রাকৃতিক ভূগোল আগে শেখে; পর্ব্বত, হ্রদ, নদী, নগর, দেশের উৎপন্নদ্রব্য প্রভৃতির

কথা জান্‌বার আগ্রহ তাদের খুব। আমাদের দেশে পালে পালে পাশ হয়, কিন্তু কেউ কোন খবরই রাখে না।

বিলাতে যারা ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করে তাদের মধ্যে শতকরা ১০।১৫ জন কলেজে যায়, কিন্তু এখানে শতকরা ৯৯ জন। কলেজে পড়্‌তে না পেলে তারা ভাবে জীবনটা নষ্ট হ'য়ে গেল। আরে পাশ্‌ করলেই মাটি! কেবল কতকগুলো অকেজো পুতুল সৃষ্টি! শিবপুর কলেজ থেকে একজন এম-এস্‌সি বা বি-এস্‌সি "অনার্স"-এর জন্যে বিজ্ঞাপন দিয়েছে, মাসিক ৫০৲ টাকা। দেখুন কি ব্যাপার দাঁড়িয়েছে! বড় ষ্টেশনে রেলের মুটে মাসে ৫০৲ টাকা রোজগার করে। যশোর জেলার শ্রমজীবী গ্রীষ্মকালে পোস্তা থেকে আম কিনে 'গোপাল্‌ভোগ', 'ক্ষীরভোগ' নাম দিয়ে দিনের বেলা বেচে। আর রাত্রে বেচে বরফ। এতে তারা একজন গ্রাজুয়েটের চেয়ে বেশী রোজগার করে। এ বিষয় আর কত বল্‌বো! এখন অর্থাগমের নূতন পথ খুল্‌তে হ'বে, শুধু পাশ কর্‌লে চল্‌বে না। বেঙ্গল কেমিক্যালে প্রথম যিনি ৭৫৲ টাকা পেতেন তিনি এখন ১০০০৲ টাকা পাচ্ছেন। গত বৎসর কারখানার কয়েকজন উচ্চশ্রেণীর রাসায়নিককে পরিচালকগণ যথেষ্ট টাকা

পুরস্কার দিয়েছেন। 'Knowledge is power', "বুদ্ধির্যস্য বলং তস্য" শুধু মুখে ব'ল্‌লে কি চলে? যার জোরে য়ুরোপ এত কর্‌লে; আমরা কি পাশ করা ছাড়া কিছুই কর্‌তে পারি না? লেখাপড়া শিখে আমরা কি কেরাণী ছাড়া আর কিছুই হ'তে পারি না? যদি এম্‌নি ক'রে শিক্ষার অপব্যবহার কর্‌তে থাকি তবে আমাদের দুর্গতির শেষ কোথায়? কলিকাতার যত লোকসংখ্যা তার প্রায় অর্দ্ধেক অ-বাঙ্গালী (non-Bengalee)—অর্থাৎ শুধু ইউরোপীয় নয়—মাড়বারী—ভাটিয়া—দিল্লাওয়ালা—হিন্দুস্থানী—ওড়িয়া—চীনে প্রভৃতি লাখে লাখে ঝাঁকে ঝাঁকে এসে বাঙ্গালীর মুখের গ্রাস কেড়ে নিচ্ছে। ব্যবসা বল—বাণিজ্য বল—যত রকম অর্থাগমের প্রকৃষ্ট উপায় সমস্তই বিদেশীর হাতে সঁপে দিয়ে আমরা অদৃষ্টের ঘাড়ে সমস্ত দোষ চাপিয়ে হাত-পা গুটিয়ে ব'সে আছি—আর শিক্ষিত এই ভান ক'রে উপবাসে ক্লিষ্টদেহে দিন কাটাচ্ছি।

অধ্যয়ন ও জ্ঞানলাভ

আমি এখনও নিজেকে ছাত্র ব'লে গণ্য করি। ঐ জীবন ত্যাগ ক'রে একদিনও অন্য জীবনে পদার্পণ করেছি ব'লে মনে হয় না। "ছাত্রাণাং অধ্যয়নং তপঃ" —বাস্তবিক এই ঋষিবাক্য বড় সত্য - বড় সার কথা। আর আমাদের এই ছাত্রজীবন ও গার্হস্থ্যজীবনের পার্থক্যের প্রাচীর বড়ই অমঙ্গলকর।

ইউরোপীয় অবস্থাপন্ন লোকের একটি 'ষ্টাডী' —অর্থাৎ পাঠাগার থাকে। সেখানে প্রবেশ কর্‌বার অর্থ এই— আর যেন কেউ না দেখে বা ঢোকে। যেমন আমাদের দেশের ঠাকুর-ঘর। ভক্ত সেখানে আপন মনে সাধনা করেন, হৃদয়দেবতাকে ভক্তির অর্ঘ্য দান করেন—কিন্তু তা' লোকচক্ষুর অন্তরালে—আর কেহ দেখে না। আমাদের পাঠাগারকে ঠাকুর-ঘরের পবিত্রতায় মণ্ডিত কর্‌তে হ'বে, তাকে নিভৃতে স্থাপন কর্‌তে হ'বে—যেন চপলতার গোলমাল সেখানে না পৌঁছায়।

আমাদের দেশে অনেক ছাত্র বাড়ীতে থাকেন, আবার অনেকে মেসে থাকেন। এখানে ছাত্রের প্রধান বিপদ এই যে, তার কোন স্বতন্ত্র পাঠাগার থাকে

না। বড়লোক বড় বাড়ীতে থাকেন—নানাকার্য্যের বন্দোবস্তের জন্য তাঁদের অনেক ব্যয় কর্‌তে হয়। কিন্তু বাড়ীর ছেলে কিরূপে কোলাহলের বাইরে নির্জ্জনে ব'সে পড়্‌বে সাধারণতঃ কোন বাড়ীতেই তার বন্দোবস্ত থাকে না—এরূপ বন্দোবস্ত যে থাকা দরকার তাও কেউ ভাল ক'রে উপলব্ধি করেন না। আর মেসের ত কথাই নেই। আমাদের দেশে কথা আছে—'একে উস্‌খুস্‌, দু'য়ে পাঠ ; তিনে গণ্ডগোল, চারে হাট।' মেসে অনেকে একত্র জোটে—কাজেই প্রত্যেকে হাটের মধ্যে গিয়ে পড়ে। হাটে হয় হট্টগোল, সরস্বতী সেখানে টিক্‌তে পারেন না ; মন্দিরে যেরূপ ভক্তের জপতপ আরাধনা—পাঠাগারে সেইরূপ ছাত্রের অধ্যয়ন ও সাধনা। ছাত্রের প্রধান কর্ত্তব্য অধ্যয়ন ; আর এই অধ্যয়ন তপস্যা ব্যতীত আর কিছু নয়। একাগ্রচিত্ততা এই তপস্যায় সিদ্ধি দান করে।

প্রথমে কথা এই যে—কি ক'রে পড়্‌তে হয়? ক' ঘণ্টা পড় তার হিসাব রাখ্‌বার দরকার নেই, কিরূপ একাগ্রতার সহিত অধ্যয়ন কর সেইটাই সবার চেয়ে দরকারি জিনিস। পড়াশুনার উদ্দেশ্য সফল কর্‌তে হ'লে, ঘণ্টার উপর নয়—একাগ্রতার উপর নির্ভর কর্‌তে হয়। আমি আজ সকালে 'খুব' পড়েছি—

কিন্তু মোটে এক ঘণ্টা কি তার কিছু বেশী। এই ভাবে আমি রোজই পড়ি, তা রবিবার নেই, ছুটীও নেই, অবকাশও নেই। এই ভাবে সমানে (নিষ্ঠা ও একাগ্রতার সহিত) পড়ে' যেতে হবে। কিন্তু এদেশে ছাত্রদের প্রধান বিপদ—গল্প, খেলা আর আড্ডা। একাগ্রতার ত সম্পূর্ণ ই অভাব ; তার উপর খেয়াল ও হুজুগে পড়্‌বার সব সময়টা কেটে যায়। পরে যখন পরীক্ষা কাছে এগিয়ে আসে তখন আহার-নিদ্রা ত্যাগ ক'রে, রাত্রি-জাগরণে স্বাস্থ্য নষ্ট ক'রে তার জন্যে প্রস্তুত হ'বার বিপুল প্রয়াস। একে লেখাপড়া বলে না, এ লেখা-পড়া নয়, এ ইউনিভারসিটিকে ফাঁকি। কেবল মুখস্থ আর উদরস্থ ; পেটুকের মিষ্টান্ন ভক্ষণের মত—এক মণ সন্দেশ টপাটপ্ ক'রে গেলা, তারপর গলায় আঙুল দিয়ে বমি। সব সময়টা ফাঁকি দিয়ে পরীক্ষা কাছে এলেই টপাটপ্ মুখস্থ ও উদরস্থ করবার প্রয়াস ; তারপর পরীক্ষামন্দিরে গিয়ে একেবারে বমি। পরীক্ষার পরই সরস্বতীর সঙ্গে সকল সম্বন্ধ লোপ। আর পাশ হ'লে 'হকার' চাচার দোকানে পুস্তক বিসর্জ্জন। মনে পড়ে, ছেলে-বেলায় জ্বর হ'ত, আর কেবল মিছ্‌রী, বেদানা ও কুইনীন্ খেতে হ'ত। বাল্যজ্বর মনে করিয়ে দেয় ব'লে ঐ জিনিসগুলোয় আমার একটা ভয়ানক বিতৃষ্ণা আছে

—ও-গুলো আমার কাছে বিভীষিকা। পাশ কর্‌বার পর এদেশের ছাত্রদের পুস্তকের উপর ঠিক ঐ রকমই তীব্র বিতৃষ্ণা হয়—বইগুলো তাদের কাছে আতঙ্ক উপস্থিত করে। পুস্তককে আজীবন সঙ্গী কর্‌তে হ'বে, কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, পরীক্ষার পর বই আর পাবার জো নাই! শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় একবার কোন ছাত্রকে বলেছিলেন, "ব্ল্যাকীর 'সেল্‌ফ্‌-কাল্‌চ্যর' বইখানা দাও ত।" সে জবাব দিলে—"সে বই তালা বন্ধ, দেখ্‌লে ভয় হয়।" এ বড় দুঃখের কথা। সৎপুস্তককে আজীবন সহচর কর্‌তে হ'বে, আজীবন ধ'রে সৎপুস্তক পাঠে ভাব সংগ্রহ কর্‌তে হ'বে, হৃদয়ে উদ্দীপনা জাগিয়ে রাখ্‌তে হ'বে এবং প্রকৃতজ্ঞানের অনুশীলন কর্‌তে হ'বে। ইংরেজ কবি সাদি পুস্তককে লক্ষ্য ক'রে যথার্থই বলেছেন—

"The mighty minds of old,
My never-failing friends are they."

পুস্তক পাঠের উদ্দেশ্য সফল কর্‌তে হ'লে খুব বেশী বই পড়্‌বার দরকার হয় না। অনেকে যা' পায় তাই পড়ে, পরিণত বয়সেও তাদের এই অভ্যাস থেকে যায়। তারা কখনো পুস্তক নির্ব্বাচন ক'রে পড়ে না। ছুটী পেলে তারা অনেক রকমে অনেক পয়সা ব্যয় কর্‌বে। বেড়াবার

সখ মেটাবার জন্যে দামী পোষাক, ট্রাঙ্ক, গ্লাড্‌ষ্টোন্‌-ব্যাগ কিন্‌বে, কিন্তু ছুটীতে পড়্‌বার জন্যে কি বই সঙ্গে নিয়ে যাবে কখনই তার কিছু স্থির কর্‌বে না। হাতে যা' পাবে তাই পড়্‌বে, কিছু বিচার কর্‌বে না। বায়রণের পত্র থেকে এমার্সন বলেন—"He knew not what to say and so he swore."। প্রথম মনে হ'ল, কি পড়্‌ব? খবরের কাগজখানা তুলে নিলাম, আগে খবর পড়্‌লাম, তারপর অন্য কথা পড়া হ'ল, শেষে বিজ্ঞাপন-স্তম্ভ পর্য্যন্ত নিঃশেষ করা গেল। কি পাওয়া গেল, কি বোঝা গেল, তার কোন চিন্তাই করলাম না। কিন্তু এরকম ঠিক নয়, উদ্দেশ্যবিহীন পাঠ কোনমতেই ঠিক নয়। সবার আগে পড়্‌বার উদ্দেশ্য খুব ভাল ক'রে বুঝ্‌তে হ'বে, তারপর রুচি অনুসারে পুস্তক নির্ব্বাচন কর্‌তে হ'বে, কারণ সকলের সব বই ভাল লাগে না, কিন্তু একটা উদ্দেশ্য মনে রেখে তারই উপযোগী পুস্তক নির্ব্বাচন করা এদেশের ছাত্রদের মধ্যে নেই বল্‌লেই চলে। যে-কোনো লাইব্রেরীর কর্ত্তৃপক্ষগণকে যদি জিজ্ঞাসা ক'রে দেখেন—"পাঠকগণ নভেল-নাটকই বা কত পড়েন আর ইতিহাস ও জীবনীই বা ক'খানা পড়েন," দেখ্‌বেন, তৃপ্তিকর উত্তর পাওয়া যাবে না।

আমাদের ছাত্রদের মধ্যে নভেলের প্রতি একটা

ভয়ঙ্কর আগ্রহ দেখা যায়। ভাল-পাশ-করা শিক্ষিত ছেলে ছুটীতে যদি নভেল পেলে ত স্নানাহার বন্ধ—যতক্ষণ না বইখানা শেষ হয়। কিন্তু একখানা বড় নভেল পড়্তে আমার ছ' মাস লাগে, কারণ আমাকে ঠিক সময়-মত কাজ কর্তে হয় ল্যাবরেটরীতে কাজ করার পর আধ ঘণ্টা সময় পেলে পড়ি, নইলে নয়। সব কাজেরই একটা নির্দ্দিষ্ট সময় থাকা চাই—সকলেরই এই প্রণালী অবলম্বন করা উচিত, বিশেষ আমাদের দেশে, যেখানে স্বাস্থ্যের একান্ত অভাব। ম্যালেরিয়ার প্রকোপে লোকে আজীবন ব্যাধিগ্রস্ত; দেশে খাবার নেই, শরীরে পুষ্টি নেই। সকলেই দীন-দরিদ্র, অন্ন-সংস্থানের ভাবনায় সবাই অস্থির। বাঙ্গালীর প্রধান পুষ্টিকর খাদ্য মাছ ও দুধ সর্ব্বত্রই দুষ্প্রাপ্য হ'য়ে উঠেছে। একে অস্বাস্থ্যের এইসব কারণ উপস্থিত রয়েছে, তার উপর ছাত্রের অতিরিক্ত পাঠ, কাজেই অল্প বয়সে স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয় এবং সে কাজের বা'র হ'য়ে পড়ে। ২৪ ঘণ্টায় একদিন। ছেলেমানুষের আট ঘণ্টা ঘুমুলেই যথেষ্ট হয়। ১৬ ঘণ্টা হাতে থাকে। তার মধ্যে রোজ ৪ ঘণ্টা পড়্লেই প্রচুর। কিন্তু পড়্তে হ'বে পরিপূর্ণ একাগ্রতার সহিত, নইলে কোন কাজ হ'বে না। বাঙ্গালী ছাত্রের প্রধান শত্রু—পড়্বার সময় অনেকের একত্র অবস্থান। এরূপ

কর্‌লে গল্প আস্‌বেই—অন্ততঃ অতর্কিতভাবে আস্‌বে। আর বাঙ্গালীর প্রধান বিপদ হচ্ছে. আড্ডা। বেশী বয়সে আমরা সবাই ব'সে কাটাই, বাহিরে উঠে হেঁটে বেড়াতে উৎসাহ আসে না, প্রবৃত্তিও হয় না; তাস-পাশাতেই কত সময় কেটে যায়। আবার এই তাস-পাশার আড্ডার পাশে অনেক সময় ছেলেরা পড়াশুনা করে। বিপদ্‌ কি ভয়ানক! ইউরোপীয়ান যখন পাঠাগারে একমনে অধ্যয়ন করে তখন তার স্ত্রীকেও "May I come in ?" ("আমি কি ভিতরে যেতে পারি ?") এই ব'লে দরজায় knock (টোকা) দিতে হয়। যেন অনিচ্ছাসত্ত্বেও ঘরে যেতে হচ্ছে, যেন শুধু বিরক্ত কর্‌তে। কারণ পাঠাগার ঠাকুর-ঘরের মত পবিত্র স্থান, সেখানে কথা কওয়া পাপ।

তারপরের কথা—

"Work while you work, play while you play,
This is the way to be cheerful and gay."—

কাজের সময় কাজ কর্‌তে হয়, খেলার সময় খেলা; তা' হ'লেই মনে আনন্দ ও উৎসাহ থাকে। আমি সর্ব্বদাই কাজ করি, আবার অবসর-মত করি না। একজন বড় ইংরেজ দোকানদার আফিসে একমনে পাঁচ-ছয় ঘণ্টা কঠিন পরিশ্রম ক'রে কাজ করে, কিন্তু যেমনি কাজ শেষ

হয় অমনি গঙ্গার ধারে—খোলা মাঠে—মুক্ত বাতাসে বেড়াতে যায়। তারা সে সময়ে ব'সে থাকে না, কুড়েমি করে না, আড্ডা বা মজ্‌লিসে জমে না। কিন্তু আমরা স্বাস্থ্য রাখ্‌তে জানি না, সময়ে কাজ করি না, তাই শরীর ও সময় দুই-এরই অপব্যবহার হয়; স্বাস্থ্যও থাকে না, কাজও ওঠে না।

এদেশে শুধু বই পড়িয়ে বিদ্যা শেখানো হয়। কিন্তু ইউরোপে সাধারণ পুস্তক পাঠের সঙ্গে প্রকৃতির উন্মুক্ত বিশাল গ্রন্থ পাঠ ক'রে জ্ঞানার্জ্জন কর্‌বার প্রবৃত্তি জাগিয়ে দেওয়া হয়। শুধু বই প'ড়ে কত শেখা যায়? নিজের চেষ্টায় বিশ্বরাজ্যের নানাপ্রকার অদ্ভুত ঘটনা নিপুণচক্ষে পর্য্যবেক্ষণ কর্‌তে হয়, তবেই প্রকৃত জ্ঞানার্জ্জন হয়। পুঁথিগত বিদ্যার দৌড় কখনই বেশী হয় না। বিখ্যাত ঔপন্যাসিক ডিকেন্স সময়ে সময়ে ছদ্মবেশে মদের দোকানে গিয়ে ব'সে থাক্‌তেন। উদ্দেশ্য, মাতালের কথাবার্ত্তা শুনে তার প্রকৃতি বুঝে দেখা। এই ভাবে নানা রকমে বিখ্যাত ইউরোপীয়েরা মানবপ্রকৃতি নিখুঁত ক'রে জান্‌বার চেষ্টা করেন। এ-ই প্রকৃত অধ্যয়ন। মানবপ্রকৃতির পর জড়প্রকৃতি। পর্য্যবেক্ষণের দ্বারা তাও বুঝ্‌তে হবে। লণ্ডনের কাছে এক বটানিকেল গার্ডেন আছে; তার নাম কিউ গার্ডেন্‌স্ (Kew

Gardens), পৃথিবীতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। উদ্ভিদ্‌বিদ্যা আহরণ কর্‌বার জন্যে শত সহস্র বিদ্যার্থী সেখানে যান। নানা রকমের গাছ, তাদের উৎপত্তি ও বৃদ্ধির নিয়ম—নিজের চোখে সুকৌশলে পর্য্যবেক্ষণ ক'রে উদ্ভিদ্‌ সম্বন্ধে তাঁরা অনেক তত্ত্ব আবিষ্কার করেছেন। আর আমাদের এই সুজলা সুফলা দেশে, এই ভারতবর্ষে গাছের ত অভাব নেই। কিন্তু উদ্ভিদ্‌ সম্বন্ধে কি তত্ত্ব জান্‌তে পেরেছি আমরা? বিলাতে তিন মাস কি তার কিছু বেশী দিন ধ'রে গাছপালার সবুজ পাতা থাকে। অন্য সময়ে কাঁচের ঘরের মধ্যে কলাগাছ প্রভৃতি বাঁচিয়ে রাখ্‌তে হয়। কিন্তু সে দেশের লোকেরা এই কয়মাসের সুবিধায় উদ্ভিদ্‌বিদ্যা অধ্যয়ন ক'রে সেই সম্বন্ধে নানা সত্য আবিষ্কার করে। আর আমরা এই চিরসবুজ দেশে চিরকালই চুপ ক'রে বসে থাকি। চক্ষুষ্মান কারা? ১৮৪৫ সালে হূকার নামে এক ইউরোপীয়ান এদেশে উদ্ভিদ্‌বিদ্যা আহরণ কর্‌তে এসেছিলেন। তখন দার্জ্জিলিঙ্গের রেল হয়নি। কিন্তু তিনি অশেষ ক্লেশ স্বীকার ক'রে গাছগাছড়া দেখ্‌বার জন্যে সিকিম গেলেন। তারপর সে দেশে বন্দী হলেন; সেই কারণে সিকিমের সঙ্গে যুদ্ধই বেধে গেল। যা হোক্‌, অক্লান্ত পরিশ্রমের পর তিনি ১০০০০ (দশ হাজার) রকম আবশ্যকীয়

গাছগাছড়া সংগ্রহ ক'রে বিলাতে ফিরে গেলেন; সে-সব এখনও কিউ গার্ডেন্‌স্‌-এ (Kew Gardens) আছে। আমাদের এমনই দুর্ভাগ্য যে, ভারতের উদ্ভিদ্‌জ্ঞান ইংরেজের বই প'ড়ে শিখ্‌তে হয়।

রক্‌স্‌বর্গের Flora Indica নামে এক অমূল্য গ্রন্থ আছে। শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে তিনি সমস্ত ভারত পদব্রজে ভ্রমণ ক'রে নানা রকম গাছ সংগ্রহ করেছিলেন এবং প্রত্যেকটির বাঙ্গালা হিন্দি তামিল নাম জোগাড় করেছিলেন। তাঁর বই সকলে পড়ে। এঁরা ইউরোপীয়ান ম্লেচ্ছ, কিন্তু আমাদের চিরস্মরণীয়।

জুয়লজিক্যাল গার্ডেনে ইউরোপীয়েরা নানা রকম পশুপক্ষী কীটপতঙ্গ প্রভৃতির জীবন-যাপন-প্রণালী অধ্যয়ন করেন। ফরাসী দেশের একজন উকিল কুড়ি বৎসর ধ'রে শুঁয়োপোকা ও প্রজাপতি কেমন ক'রে এক থেকে অপরে পরিণত হয় তা' পর্য্যবেক্ষণ করেছেন, আর তার একটি কৌতূহলপ্রদ বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন। এ ছাড়া তিনি নিজের চোখে গুঠি ও তুঁত-পোকার জীবন-যাত্রা দেখে ঐ সকল কীট থেকে রেশম উৎপন্ন করা সম্বন্ধে অনেক আবশ্যকীয় নূতন কথা সভ্যজগৎকে জানিয়েছেন। আর, একজন অন্ধ মধুমক্ষিকার ইতিহাস লিখেছেন। তিনি যৌবনে অন্ধ হয়েছিলেন। তাই

তাঁর স্ত্রী ও ভৃত্য মধুমক্ষিকার জীবনযাত্রা পর্য্যবেক্ষণ ক'রে সেই-সব কথা তাঁর কাছে বল্‌তেন এবং তিনি বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে তা' লিপিবদ্ধ কর্‌তেন। এই প্রকারে হিউবার (Huber) তাঁর বিখ্যাত পুস্তক মৌমাছির ইতিবৃত্ত (History of the Bees) লিখেছেন।

ইংরেজ ও আমেরিকানের এক-একটা hobby, অর্থাৎ খেয়াল আছে। কেউ গার্ডেনিং করেন, বাগানে নানা রকম ফলফুল উৎপন্ন করেন। এ একটা সুন্দর খেয়াল। কেউ বা প্রাণীতত্ত্ব অধ্যয়ন করেন, আবার কেউ বা পতঙ্গবিজ্ঞান (Entomology) সম্বন্ধে আলোচনা করেন। আমাদের ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর লর্ড কারমাইকেল নিজে পতঙ্গ সম্বন্ধে আলোচনা করতেন। ইংরেজ কখনো ব'সে থাকে না। এই রকম একটা খেয়ালে থাকে। এই সকল ব্যাপার অধ্যয়ন ক'রে তাঁদের সকলেই যে কলেজের অধ্যাপক হ'ন তা নয়, কিন্তু এই সব কথা পুস্তকে প্রকাশ ক'রে তাঁরা জ্ঞানভাণ্ডার বৃদ্ধি করেন, তাঁদের বিলক্ষণ আয়ও হয়।

এদেশে গবর্ণমেণ্ট পুনা কৃষিকলেজে লেফ্রয় (Lefroy) নামক একজন মস্ত পতঙ্গবিজ্ঞানবিৎকে (Entomologist) আনিয়াছেন। তিনি কোন্ কোন্ পতঙ্গ শস্য নষ্ট করে সে সম্বন্ধে আলোচনা

কর্ছেন। আমরা জানি, শুধু পঙ্গপালই ফসল নষ্ট ক'রে দেয়; কিন্তু আরও অনেক রকম পতঙ্গ আছে যারা ফসলের বড় কম ক্ষতি করে না। ইনি তাদেরই জীবনচরিত আলোচনা কর্ছেন আর কিসে তাদের নষ্ট ক'রে শস্য বাঁচানো যায় তার উপায় আবিষ্কার কর্বার চেষ্টা করছেন। এই সকল ব্যাপারের আলোচনা ও অধ্যয়ন আমাদের ব্যবসা ও ধনাগম সম্বন্ধে অনেক সাহায্য করে। যাঁরা পতঙ্গবিজ্ঞান অধ্যয়ন করেছেন, তাঁরা কি ক'রে তুঁতপোকাকে রোগের হাত থেকে রক্ষা ক'রে বর্দ্ধিত কর্তে হয় তা' জানেন। গুটিপোকার রোগ হ'লে তা' থেকে ভাল রেশম হয় না। ফ্রান্সে 'Disease of Silkworm"—অর্থাৎ গুটিপোকার রোগ সম্বন্ধে পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে। সেই বই প'ড়ে যাঁরা রেশমের চাষ করেন তাঁরা গুটিপোকাকে বর্দ্ধিত করবার নানা রকম উপায় জান্তে পেরেছেন, আর সেই কারণে রেশমের চাষে খুব লাভবান হয়েছেন। আর আমাদের দেশে মুর্শিদাবাদ ও বহরমপুরে—যেখানকার উৎকৃষ্ট রেশম এক সময়ে সব দেশে আদৃত হ'ত—সেখানে রেশমের চাষ দিন দিন উঠে যাচ্ছে; কারণ আমরা ঐ কাজ অজ্ঞ চাষাদের হাতে ফেলে রেখে দিয়েছি, যাদের গুটিপোকা সম্বন্ধে খুব বেশী কিছু জ্ঞান নেই।

এই সমস্ত কারণেই বল্‌ছি যে, শেখ্‌বার অনেক আছে, শুধু কেতাব পড়্‌লেই হয় না। আমি এলবার্ট স্কুলে পড়তাম। সেখানে প্রত্যেক শনিবার কেশব সেনের বক্তৃতা হ'ত। তিনি এক সময়ে বলেছিলেন, "বাঙ্গালীর ছেলের লেখাপড়া শেখা যেন বালিশের খোলে তূলো পুরে দেওয়া; কেবল ঠাসো আর গাদো।" তার উপর অভিভাবক সর্ব্বনাশ করছেন—স্কুলের ছুটি হ'লেই মাষ্টারবাবুকে ছেলের পিছনে লেলিয়ে দেবেন, ছেলে বিদ্যে শিখবে। এঁরা হচ্ছেন murderer of boys—অর্থাৎ বালকহন্তা; কারণ স্কুলের ছুটির পর অন্ততঃ দুই বা আড়াই ঘণ্টা খেলা চাই। সে সময়টা খোলা মাঠে ছোটো, দৌড়াও, লাফাও, নদীতে নৌকা বাও। তবে ত স্বাস্থ্য থাক্‌বে, মনে প্রফুল্লতা আস্‌বে। তা' নয়, বাড়ী এসেই কেতাব নিয়ে বসো। তারপর কোন্ ছেলে কোন্ বিষয়ে backward—অর্থাৎ কাঁচা, অমনি প্রাইভেট্ টিউটর লাগাও—ইংলিশে একটি, সংস্কৃতে একটি, সব বিষয়ে একটি একটি। টিউটরের ঠেলায় বেচারি ছাত্র একেবারে dull—অর্থাৎ গাধা হয়ে ওঠে, নিজে ভাব্‌বার বা নিজের উপর নির্ভর কর্‌বার শক্তি তার একেবারে লোপ পায়। তাই বলি, এ প্রথার অনেক দোষ! এমার্সন বলেন, "Guardians are

benefactors but sometimes they act like the worst malefactors"—অভিভাবকগণ ছেলের উপকার করেন বটে, কিন্তু সময়ে সময়ে ভয়ঙ্কর অপকার সাধন ক'রে থাকেন। বেশী পড়্‌লেই বিদ্যে হয় না. আমি আজীবন ধ'রে সামান্য একটি বিদ্যা আয়ত্ত করবার চেষ্টা কর্‌ছি, কিন্তু পাঠ ঐ এক ঘণ্টা।

আমাদের বাঙ্গালীর ছেলের জীবন যেন একটা ভার বওয়া। বেদান্ত-মতে জীবন কিছুই নয়, দু'হাজার বছর ধ'রে আমরা চিরকাল শুনে আস্‌ছি, জীবন মানে কিছুই নয়—নলিনীদলগতজলমিব—এর একটা প্রভাব জাতীয় চরিত্রে ত আছেই। আমরা সকলেই খানিকটা স্বীকার ক'রে নিই যে. জীবন একটা দুর্ব্বহ ভার। তার উপর আবার এই ভয়ঙ্কর জীবনসংগ্রাম। সকালে আটটার সময় বাড়ী থেকে দৌড়োদৌড়ি ক'রে ম্যালেরিয়া-জীর্ণ শরীরখানি নিয়ে ডেলি প্যাসেঞ্জারি করা—অর্থাৎ কলম-পিষে জীবিকা-অর্জ্জনের জন্য সহরের দিকে ছুটোছুটি করা। দিন যে কোথা দিয়ে চলে যায়, দুর্ভাগ্য বাঙ্গালী তা' জান্‌তে পারে না—পৃথিবীর কোন আনন্দই সে উপভোগ করে না। আকাশের উন্মুক্ততা, আলোকের হাসি বা বাতাসের সুখময় স্পর্শ কিছুই তার প্রাণে সজীবতা ও নবীনতা আনয়ন করে না। লাবকের

'জীবনের সুখ' নামে একখানি পুস্তক আছে। ঐ পুস্তকে তিনি বল্‌ছেন—জীবন কি শুধু ঔষধ গেলা? জীবনে আনন্দ উপভোগই বিধাতার উদ্দেশ্য। কিন্তু আমরা কর্ম্মদোষে সেই উদ্দেশ্য বিফল করি। পাখী গায় কেন, প্রজাপতি মধু আহরণ করে কেন, যদি বিধাতার সৃষ্টিতে আনন্দ না থাকে।

লাবক একজন ধনী মহাজন (broker) ছিলেন। অতুল তাঁহার ধন-ঐশ্বর্য্য, কিন্তু তিনি লেখাপড়া যথেষ্ট জান্‌তেন। তিনি আজীবন ছাত্র ("student")। অনেক ইউরোপীয় ধনী মৌমাছি, পিঁপ্‌ড়া প্রভৃতি সম্বন্ধে অনেক নূতন কথা আবিষ্কার করেছেন। আমরা তা' বই প'ড়ে জানি, কিন্তু তাঁরা নিজের চোখে দেখে ঐসব কথা লিখে গেছেন। আমরা চোখ থাকতেও অন্ধ। শুধু চোখ থাক্‌লেই হয় না, সূক্ষ্ম-দর্শন চাই। ইউ-রোপীয়ান লেখক লাবক মৌমাছিদের সাধারণতন্ত্র (Republic) সম্বন্ধে এক চমৎকার বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন। মৌচাকে কেমন ক'রে সকলে কাজ করে সে অদ্ভুত বিবরণ পড়্‌লে মাতোয়ারা হয়ে উঠতে হয়। লর্ড এভ্‌বেরী (Sir John Lubbock) যে শুধু ধনী ছিলেন তা নয়, তিনি একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ও চিন্তাশীল লেখক। আমাদের দেশের ধনী সাধারণতঃ

জবড়্‌জং জানোয়ার হয়। তার নাকের ডগা থেকে ওলন-দড়ি ঝুলিয়ে দিলে ভুঁড়ির দরুণ perpendicular অর্থাৎ লম্ব-রেখার যে বিচ্যুতি হয় তাই তাঁর ধনশালিতার মাপ। ধনী জুড়ি চড়েন আর আয়েসে বিলাসে ডুবে থাকেন। কিন্তু ইউরোপে অনেক স্থলে এরূপ হয় না। বিলাতে মাটির তলায় রেল (under-ground railway) আছে। তাতে প্রথম, দ্বিতীয় বা তৃতীয় শ্রেণী নেই। লাখ্‌পতি ও সাধারণ লোক সব এক সঙ্গে এক জায়গায় বসে। এণ্ড্রু কার্ণেগী একজন ক্রোড়-পতি; পৃথিবীতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লৌহ-কারখানার মালিক। আমেরিকার পিট্‌স্‌বর্গে তাঁর লোহার কারখানা ছিল। প্রথম বয়সে তিনি খবরের কাগজ রাস্তায় বেচ্‌তেন। তারপর অসাধারণ অধ্যবসায়ের বলে আমেরিকায় অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হ'ন। পরে টাকা রোজ্‌গার ত্যাগ ক'রে অধ্যয়নে শান্তিপূর্ণ জীবন যাপন করেন। তাঁর ব্যবসা এত বড় ছিল যে, একজনে নয়— অনেকে প'ড়ে ৯০ কোটি টাকা দিয়ে সেই ব্যবসাটি কিনেছেন; তার বাৎসরিক আয় হচ্চে সাড়ে চার কোটি টাকা। তিনি শ্রমজীবীদের জন্যে আমেরিকা ও স্কট্‌ল্যাণ্ডের অনেক সহরে বিনাব্যয়ে অধিগম্য পাঠাগার স্থাপন করেছেন। মজুরগণ সন্ধ্যার পর যখন অবসর পায় তখন ঐ সমস্ত

লাইব্রেরীতে নানাপ্রকার উৎকৃষ্ট পুস্তক পাঠ ক'রে আত্মোন্নতি সাধন করে। কার্ণেগী এখনও (এই বছর দু' তিন নয়) অনেক বই লিখ্‌ছেন। নাইন্টিন্থ্‌ সেঞ্চুরী পত্রিকায় তিনি শ্রমজীবীদের উন্নতি সম্বন্ধে অনেক প্রবন্ধ প্রকাশ করেছেন। আগেই বলেছি, তাঁর আয় ছিল সাড়ে চার কোটি টাকা। আমাদের এই বাঙ্গালা, বেহার ও অন্য জায়গার সকল জমিদারের বাৎসরিক আয় জড়িয়ে সাড়ে চার কোটি নয়। এখানকার সকল জমিদারকে একদিকে আর কার্ণেগীকে একদিকে রেখে ওজন কর্‌লে টাকায় তিনিই ভারী হবেন। কিন্তু বিচিত্র কথা এই যে, তিনি এখনও পড়েন। ছিলেন "ষ্ট্রীট্‌ বয়", রাস্তায় কাগজ বেচ্‌তেন, কেবল স্বাবলম্বনের জোরে লক্ষ্মী-সরস্বতীর বরপুত্র হয়েছেন।

তোমরা অনেকেই ইউনিভারসিটির ফার্ষ্ট সেকেণ্ড হও; সেটা ভাল; কিন্তু আমাদের দেশের অপযশ। কারণ পাশের পর তোমরা নষ্টস্বাস্থ্য, ম্যালেরিয়াজীর্ণ, রুগ্ন, ক্লিষ্ট, ক্ষীণদৃষ্টি। এ রকম ভাল-পাশ করা ছেলের যজ্জীবনম্‌ তন্মরণম্‌। ইংলণ্ডে কিন্তু তা' নয়। সেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ে ছেলেরা খুব বেশী পড়ে না, অকালপক্ক হয় না, এঁচোড়ে পাকে না। ১৮৭৫ সালে ফার্ষ্ট ক্লাশ পাশ ক'রে আমরা আজীবন তার দোহাই দিয়ে থাকি,

যদিও এই পাশ করার পর লেখা-পড়ার সঙ্গে আর কোন সম্পর্কই আমাদের থাকে না। তারপর এই ফার্ষ্ট ক্লাশ পাশ করাটাই বা কি? বিশ্ববিদ্যালয়ের যা' academic year তাতে ত দু'বছরে দশমাস মাত্র পড়া হয়। এই দশমাস প'ড়ে সব বিদ্যা আয়ত্ত হয়ে যায় কি? আজীবন না পড়লে শেখা যায় না। প্রত্যেক দিন নূতন নূতন তত্ত্ব প্রকাশিত হচ্ছে, সে-সকলের খবর রাখতে হবে। ফার্ষ্ট হও আর না হও, আজীবন পড়বে, পাশ হবার পরেই কেতাবের সঙ্গে সেলাম আলেকম্ ক'রে তার নিকট চিরবিদায় গ্রহণ কি ভয়ঙ্কর! কি সর্ব্বনাশ! এখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী দেখলে আতঙ্কে আমার প্রাণ শিউরে ওঠে। তারা ছদ্মবেশী মূর্খ।

এমার্সন বলেন, "কোন ছেলে backward অর্থাৎ পড়াশুনায় কাঁচা হ'লে তিরস্কার করবে না। সাধারণতঃ ছেলেরা সব বিষয়ে ভাল বা চৌকস হয় না। যে সব বিষয়ে ভাল সে ত একটা miracle—একটা অদ্ভুত কিছু, যা ভূতলে অতুল।" এমার্সন আরও বলেন, "কোন ভাল ছেলে যদি চুরি ক'রে ক্লাসের বই ছাড়া অন্য বই পড়ে, মাষ্টার তাকে বেত মারেন; আমি হ'লে পুরস্কার দিই।" ছাত্র হয়ত নেপোলিয়নের জীবনী বা

গোল্ডস্মিথের ইতিহাস বা যা' তার স্কুলপাঠ্য নয় এমন কিছু পড়ছে, তাতে বাধা দেওয়া অন্যায়, উৎসাহ দেওয়া যুক্তিসঙ্গত, কারণ সে অনেক নূতন বিষয় শিখতে পারবে। ছাত্রের প্রতি চাপ দেওয়া উচিত নয়, তার প্রতিভার যাতে বিকাশ হয় শিক্ষকদের তাই করা চাই। ইউনিভারসিটির বাঁধা বই পড়লে বা গোটাকতক পাশ করলে প্রতিভার বিকাশ হয় না। হালিসহরে রামপ্রসাদ জন্মেছিলেন, তাঁর কথা সবাই জান। তিনি হিসাব লেখার এক চাকরি পেয়েছিলেন, কিন্তু খাতার পিঠে পিঠে কালী-সংকীর্ত্তন লিখতেন। এমন কি ভারতের যে দু'জন জগতে অসাধারণ কীর্ত্তি অর্জ্জন করছেন,—রবীন্দ্রনাথ ও রামানুজম্ (ইনি সম্প্রতি রয়েল সোসাইটির সভ্য হয়েছেন) তাঁদের কেউই ইউনিভারসিটি এডুকেশনের ধার ধারেন না, তাঁরা পাশ-করা নন। কিন্তু এই পাশ না করতে পারলেই আমাদের ছেলেদের মুখ আঁধার। মা বলেন—পোড়াকপাল আমার, ছেলে পাশ হলো না। আবার সময় সময় ছেলে আত্মহত্যা ক'রে বসে। আমি বলি—তোমার যা' ভাল লাগে তাই কর। উৎসাহের সহিত একটা নূতন কিছু আরম্ভ ক'রে দাও। কারণ উকিল, ডাক্তার ও কেরাণী এই নিয়ে জাতি টেকে না। আমাদের চরম দুর্গতি হয়েছে। এখন আমাদের নানা

বিষয়ে, অর্থকর বিষয়ে, ব্যবসাবাণিজ্যে মন দিতে হবে। এ সম্বন্ধে আমি আমার লিখিত "বাঙ্গালীর মস্তিষ্ক ও তাহার অপব্যবহার" নামক পুস্তিকায় কয়েকটা কথা লিখেছি, তোমরা সেটা প'ড়ে দেখো। আমাদের অবস্থা দেখে মনে হয়, বিধাতা যেন বলেন, "বাঙ্গালীর ছেলে, শরীর নষ্ট করবি আর কেরাণীগিরি করবি; তার বেশী কিছুই নয়।" এ অবস্থায় থাকলে চলবে না, এ জীবনের পথ নয়, মৃত্যুর পথ; এ পথে থেকে ফিরতেই হবে।

বিজ্ঞানচর্চ্চা—প্রাচীন ও নব্য ভারতে—

একনিষ্ঠ সাধনা

(১)

পরীক্ষা ও পর্য্যবেক্ষণের উপরই বিজ্ঞানের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং রামচন্দ্র-কৃত "রসেন্দ্রচিন্তামণি" ও যশোধর-কৃত "রস-প্রকাশ-সুধাকর" এই দুই প্রসিদ্ধ রসায়নশাস্ত্রে যে-সকল বর্ণনা আছে তাহা পাঠ করিয়া স্বতঃই আনন্দ উপভোগ করা যায়। ঐ দুইখানি গ্রন্থই খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ কিংবা চতুর্দ্দশ শতাব্দীর পূর্ব্বে লিখিত। রামচন্দ্র বলেন :—

অশ্রৌষং বহুবিদূষাং মুখাদপশ্যং
শাস্ত্রেষু স্থিতমকৃতং ন তল্লিখামি।
যৎকর্ম্ম ব্যরচয়মগ্রতো গুরুণাং
প্রৌঢ়াণাং তদহি বদামি বীতশঙ্কঃ ॥
অধ্যাপয়ন্তি যদি দর্শয়িতুং ক্ষমন্তে
সূতেন্দ্র কর্ম্মগুরবো গুরবস্ত এব।
শিষ্যাস্ত এব রচয়ন্তি গুরোঃ পুরো যে
শেষাঃ পুনস্তদুভয়াভিনয়ং ভজন্তে ॥

অর্থাৎ—যাহা বহু পণ্ডিতের মুখে শুনিয়াছি এবং

শাস্ত্রে দেখিয়াছি, কিন্তু কার্য্যদ্বারা সম্পূর্ণ করি নাই, তাহা না লিখিয়া, বৃদ্ধবৈদ্যের সম্মুখে শুনিয়া যেগুলি কার্য্যদ্বারা সম্পন্ন করিয়াছি, আমি নিঃশঙ্কচিত্তে সেইগুলিই এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিতেছি। যে-সকল গুরু রসকর্ম্ম অধ্যয়ন করাইয়া তাহা কার্য্যে দেখাইতে সমর্থ হয়েন, তাঁহারাই যথার্থ গুরু; যে সকল শিষ্য অধ্যয়ন করিয়া গুরুসমক্ষে সেই-সমস্ত সম্পন্ন করিতে পারেন, তাঁহারাই প্রশংসনীয় শিষ্য। তদ্ভিন্ন উভয়বিধ গুরুশিষ্যই অভিনেতা মাত্র॥

যশোধরের উক্তি ঃ—

স্বহস্তেন কৃতং সম্যক্ জারণং ন শ্রুতং ময়া
স্বহস্তেন ভবযোগেন কৃতং সম্যক্ শ্রুতেন হি
দৃষ্টপ্রত্যয় যোগোঽয়ং কথিতো মাত্র সংশয়।

অর্থাৎ—আমি যাহা কিছু লিপিবদ্ধ করিতেছি তাহার যাথার্থ্য ও সাফল্য সম্বন্ধে পরীক্ষা দ্বারা স্থির-নিশ্চয় হইয়াছি।

পৃথিবীর প্রাচীন জাতিরা রসায়নশাস্ত্রে কতদূর পারদর্শী হইয়াছিলেন তাহা অবগত হইতে আমার চিরকাল কৌতূহল আছে। প্রায় পঁয়ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে যখন আমি এডিন্‌বরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলাম তখন হইতে টম্‌সন, হোয়েফর, কপ্‌ প্রভৃতি মনীষিগণের

বিখ্যাত গ্রন্থসমূহ আমার প্রিয় সঙ্গী ছিল। সেই সময় ভারতবাসিগণ রসায়নশাস্ত্রে কিরূপ উন্নতিসাধন করিয়াছিলেন তাহা জানিবার জন্য আমার মনে স্বতঃই অনুসন্ধান করিবার স্পৃহা জাগরূক হয়। এই নিমিত্তই আমি 'চরক', 'সুশ্রুত' প্রভৃতি আয়ুর্ব্বেদ ও তন্ত্রশাস্ত্রের যে-সকল প্রসিদ্ধ গ্রন্থ কালের করাল কবলে অবলুপ্ত হয় নাই তাহা লইয়া রাসায়নিকের দিক্ হইতে অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হই।

এই বিষয়ে অনুসন্ধান করিতে করিতে প্রায় একবিংশ বৎসর পূর্ব্বে আমি মসিয় বার্থেলোর সংশ্রবে আসি। এই ঘটনা আমার ঐতিহাসিক রসায়নশাস্ত্রপাঠের পথনির্দ্দেশক স্বরূপ। যিনি প্রতীচ্যজগতে রসায়নশাস্ত্রের কিরূপ উন্নতি হইয়াছিল ও কোন্ স্থান হইতে তত্রত্য লোকেরা ঐ বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিল তাহা সর্ব্বাপেক্ষা প্রকৃষ্টরূপে নির্দ্দেশ করিয়া যশস্বী হইয়াছেন, সেই তৎকালীন রাসায়নিকদিগের অধিনেতা জগদ্বিখ্যাত ফরাসী বৈজ্ঞানিক, হিন্দুগণ রসায়নশাস্ত্রে কিরূপ উন্নতিলাভ করিয়াছিল তাহা জানিবার জন্য উদ্গ্রীব হইয়াছিলেন। এমন কি তিনি ঐ বিষয়ের অনুসন্ধান করিবার জন্য আমাকে বিশেষ করিয়া অনুরোধ করিলেন। তাঁহার এই সাধুসঙ্কল্পে প্রণোদিত হইয়া

আমি রসেন্দ্রসারসংগ্রহ নামক গ্রন্থের উপর ভিত্তিস্থাপন করিয়া ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহাকে ভারতীয় রসায়নশাস্ত্র-বিষয়ক এক ক্ষুদ্র প্রবন্ধ প্রেরণ করি। পরে দেখিতে পাই যে, ঐ গ্রন্থের কোন বিশেষত্ব নাই, কারণ উহা দ্বারা হিন্দু রসায়নশাস্ত্রের উৎপত্তির হেতু অবগত হওয়া যায় না। বার্থেলো যে ঐ প্রবন্ধের বিস্তৃত সমালোচনা করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছিলেন তাহা নহে; তিনি অনুগ্রহ করিয়া তাঁহার "মধ্যযুগে রসায়নশাস্ত্র" নামক তিনখণ্ড বিশাল গ্রন্থ আমাকে উপহার পাঠাইয়াছিলেন। ঐ গ্রন্থ প্রধানতঃ আরব ও সীরিয় গ্রন্থাবলী অবলম্বনে লিখিত। আমি কিন্তু তখনও উহাদের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত অবগত ছিলাম না। উহা অধ্যয়ন করিবার পর হিন্দু রসায়নশাস্ত্র সম্বন্ধে একখণ্ড পুস্তক লিখিয়া ঐ গ্রন্থাবলী সম্পূর্ণ করিবার উচ্চ আশা আমার মনে উদিত হয়।

যখন আমি স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া ঐ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলাম তখন আমার মনে নানা দ্বিধা উপস্থিত হইয়াছিল তাহা স্বীকার করি। কারণ আমার ভয় হইয়াছিল যে, তথ্যগুলি বুঝি অতি সামান্য ও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। যাহা হউক, আমি পূর্ণ উদ্যমে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলাম। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে যতই অগ্রসর হইতে লাগিলাম ততই পুরাতন জার্ণ কীটদষ্ট রসায়নশাস্ত্রের

পুঁথির প্রাচুর্য্য দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। মান্দ্রাজ, তাঞ্জোর, আলোওয়ার, বারাণসী, কাটামণ্ডু (নেপাল) প্রভৃতি স্থান হইতে ঐ-সকল পুঁথি আসিতে লাগিল। এমন কি তিব্বত হইতেও তাঞ্জুর নামে এক বহুমূল্য গ্রন্থ পাইয়াছিলাম। ১৯০৪।৫ খ্রীষ্টাব্দে যখন লাসা কিছুদিনের জন্য ইংরেজ কর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়াছিল সেই সময় ভারতীয় সর্ব্ববিদ্যাবিষয়ক ঐ গ্রন্থ এই দেশে আসে। বহুবর্ষ নিষ্ফল চেষ্টার পর রত্নান্বেষী দৈবাৎ এক বহুমূল্য ধাতুর খনি আবিষ্কার করিলে তাহার মনে যেরূপ আনন্দের উদ্রেক হয় আমিও সেইরূপ আনন্দে আত্মহারা হইলাম। যদিও পুস্তকাগার ও রাসায়নিক পরীক্ষাগারে যথোপযুক্ত সময় বণ্টন করিতে আমার অসুবিধা হইয়াছিল তথাপি লুপ্ত রত্নরাজির আবিষ্কার আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ দ্বাদশবর্ষকাল নিয়োজিত করিয়াছিল। এখন আমি আপনাদিগকে গবেষণার কতক ফল প্রদর্শন করিব। প্রাচীন ভারতে পাঠ্যতালিকাভুক্ত সাহিত্য ও অন্যান্য শাস্ত্রের সহিত বৈদ্যশাস্ত্রও শিক্ষা দেওয়া হইত। প্রায় ২৫০০ বৎসর পূর্ব্বে তক্ষশিলা বিশ্ববিদ্যালয়ে জীবক কোমারভচ্চ ঋষি আত্রেয়ের নিকট আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিতেন। কোমারভচ্চ কথাটি সংস্কৃত কৌমারভৃত্য এই কথার অপভ্রংশ। আয়ুর্ব্বেদ-

শাস্ত্রবেত্তারা অবগত আছেন যে, ঐ শাস্ত্র আটভাগে বিভক্ত। কৌমারভৃত্য অথবা শিশুচিকিৎসা তাহাদের মধ্যে অন্যতম। জীবক পরে বুদ্ধের সমসাময়িক মগধাধিপতি বিম্বিসারের রাজবৈদ্য হইয়াছিলেন। খ্রীষ্টীয় বহু শতাব্দী পূর্ব্বে যে ভারতে আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রের আলোচনা হইত ইহা হইতে তাহার ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায়। আমি যে বিজ্ঞানের আলোচনা করি, সেই রসায়নশাস্ত্র কিন্তু এত প্রাচীন বলিয়া কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। রসায়ন কিন্তু যথার্থ কেমিষ্ট্রী (Chemistry) নহে। রসায়নের ধাতুগত অর্থ এমন একটি ঔষধ যাহা দ্বারা লোকে দীর্ঘজীবন, স্মরণশক্তির প্রাথর্য্য, স্বাস্থ্য ও পুরুষত্ব লাভ করে (চরক অ ১-২-৬)। ধরিতে গেলে ইহাই মধ্যযুগের রাসায়নিকদিগের জীবন-সলিল। পরে তান্ত্রিক যুগে ঔষধার্থে পারদ ও অন্যান্য ধাতু ব্যবহার করাকেই রসায়ন বলা হইত। এখন ইহা এল্‌কেমি বা কেমিষ্ট্রী (Chemistry) অর্থে ব্যবহৃত হয়। খ্রীঃ ত্রয়োদশ কিংবা চতুর্দ্দশ শতাব্দীর এক রসায়নগ্রন্থের লেখক তাঁহার বিষয়কে রসায়নীবিদ্যা নামে অভিহিত করিয়াছেন। রসরত্নসমুচ্চয় (অর্থাৎ পারদ ও অন্যান্য ধাতুর রূপান্তর-সমাচার) নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থের প্রারম্ভে গ্রন্থকার ২৭ জন সিদ্ধিদাতাকে প্রণাম

করিয়াছেন। রসসিদ্ধিপ্রদায়ক অর্থে সেই লোক বুঝায় যাহারা পারদঘটিত ঔষধ প্রস্তুত বিষয়ে নৈপুণ্যপ্রদানে সক্ষম। ইহা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রে—অর্থাৎ চরক, সুশ্রুত, বাগ্ভট প্রভৃতি গ্রন্থে পারদ-ঘটিত ঔষধের উল্লেখ কদাচিৎ পাওয়া যায়।

পূর্ব্বকালে ভারতে রসায়নশাস্ত্রের চর্চ্চা কিরূপ উৎকর্ষলাভ করিয়াছিল তাহা উপলব্ধি করিতে হইলে আর এক প্রসঙ্গের উল্লেখ করিতে হইতেছে। মধ্য-যুগে ইউরোপে রসায়নশাস্ত্র অথবা এল্‌কেমি (Alchemy) চিকিৎসাশাস্ত্রের সহচররূপে যথেষ্ট উন্নতিলাভ করিয়াছিল। যদিও আমাদের দেশে উহা আয়ুর্ব্বেদের আনুষঙ্গিকরূপে বিবেচিত হইত, তথাপি যোগশাস্ত্রের সহিত লিখিত হওয়ায় উহা দ্রুত উন্নতিসাধন করিয়াছিল। আপনারা অবগত আছেন, এই যোগশাস্ত্রের মতে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে হইলে সপ্তপ্রকার অবস্থা অতিক্রম করিতে হয় এবং অষ্টবিধ উপায়ে এই জ্ঞান লাভ করা যায়। ইহার মধ্যে ধারণ, ধ্যান ও সমাধি প্রধান। এই তিনের সমাবেশ হইলেই সংযম হয় এবং লোকে সিদ্ধিলাভ করে। উত্তরকালে এই যোগশাস্ত্র রসায়ন-বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত হয়; বিশেষতঃ বঙ্গদেশে ইহা তান্ত্রিক ক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত হয়।

রসায়নীবিদ্যা এই-সকল তন্ত্রে কেন আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল ইহার উত্তর রসার্ণব দিয়াছেন। রসার্ণব রসায়নশাস্ত্র-বিষয়ক অতি প্রাচীন তন্ত্র। পণ্ডিত হরিশ্চন্দ্র কবিরত্ন মহাশয়ের সহায়তায় বিব্লিয়োথেকা ইণ্ডিকা (Bibliotheca Indica) গ্রন্থমালায় আমি এই গ্রন্থ প্রকাশিত করিয়াছি। ইহাতে পারদ ও তদ্‌ঘটিত ঔষধের গুণ কীর্ত্তিত হইয়াছে।

খ্রীঃ একাদশ শতাব্দীর মধ্যেই যোগদর্শনের সহিত রসায়নের সম্বন্ধ সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। গজ্‌নীর মামুদের সমসাময়িক সুবিখ্যাত আল্‌বিরুনী বলেন— "এই শাস্ত্রবিদ্‌গণ এই শাস্ত্র গুপ্ত রাখিতে চেষ্টা করেন এবং অভিজ্ঞ লোকের সংস্রবে আসিতে কুণ্ঠিত হ'ন। এই হেতু হিন্দুরা এই বিজ্ঞানে কি প্রণালী অবলম্বন করেন এবং ধাতব, জান্তব অথবা ভৈষজ্য কোন্ পদার্থের প্রচুর ব্যবহার করেন তাহা তাঁহাদের নিকট জানিতে পারি নাই। তাঁহাদিগকে কেবল ঊর্দ্ধপাতন, ভস্মীকরণ, বিশ্লেষণ ও তালকের জারণ এই কয়েক প্রকার প্রক্রিয়া উল্লেখ করিতে শুনিয়াছি। ইহা হইতে আমার বোধ হয়, তাঁহারা খনিজ রসায়ন-শাস্ত্রেরই চর্চ্চা করিতেন।

"এল্‌কেমির মত তাঁহাদের এক অদ্ভুত বিজ্ঞান

আছে। তাঁহারা ইহাকে রসায়ন বলেন। এই বিদ্যা কতকগুলি প্রক্রিয়া এবং প্রধানতঃ ভৈষজ্য ঔষধের মধ্যে আবদ্ধ। ইহাতে হতাশ রোগীও সুস্থ হয়; বৃদ্ধ যৌবন লাভ করিয়া যুবকের ন্যায় সবলেন্দ্রিয় ও কার্য্যক্ষম হয়; এমন কি ইহা দ্বারা ইহজীবন বহুকাল পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত হয়। কেনই বা হইবে না? পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, পতঞ্জলির মতে রসায়ন জীবন্মুক্তির অন্যতম উপায়।"

তান্ত্রিক ক্রিয়াকলাপ-সংলগ্ন রসায়নের গ্রন্থ অসংখ্য। খ্রীঃ একাদশ হইতে চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মধ্যে এই-সকল গ্রন্থ এতদূর প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল যে, ইহারা তৎকাল প্রচলিত দর্শনশাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গণ্য হইত। আপনারা সকলেই অবগত আছেন যে, বিজয়নগরাধিপতি প্রথম বুক্কের মন্ত্রী সুবিখ্যাত মাধবাচার্য্য তাঁহার "সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে" তৎকালপ্রচলিত ষোড়শ দর্শনের মধ্যে রসেশ্বরদর্শন—অর্থাৎ পারদবিজ্ঞান নামে এক পরিচ্ছেদ লিখিয়াছেন। মান্দ্রাজের সন্নিপাতী শৃঙ্গেরী মঠের মোহান্ত ঐ বিষয় বর্ণনা করিবার সময় রসার্ণব, রসেশ্বরসিদ্ধান্ত, রসহৃদয় প্রভৃতি বিখ্যাত রসায়নশাস্ত্র হইতে প্রচুর বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন।

রসার্ণবের যে অধ্যায়ে রাসায়নিক মন্ত্র, অগ্নিশিখার

বর্ণ, খনিজ প্রস্তর হইতে ধাতু বহিষ্করণ, প্রভৃতি আছে, সেই অধ্যায় হইতে আমি এখন কিছু কিছু উদ্ধৃত করিতে ইচ্ছা করি। বলা বাহুল্য যে তন্ত্রগুলি শিবদুর্গার কথোপকথন রূপে লিখিত।

রাসায়নিক যন্ত্র ও অগ্নিশিখার বর্ণ

শ্রীভৈরব—রস, উপরস, বিবিধ ধাতু, বস্ত্রখণ্ড, ভস্ত্রা, লৌহযন্ত্র, প্রস্তর-নির্ম্মিত খল, কোষ্ঠিক, বাঁকনল, গোময়, কাষ্ঠ, বিবিধ মৃন্ময় ও লৌহযন্ত্র, সন্দংশ, মৃন্ময় ও লৌহপাত্র, নিক্তি ও ওজন, বংশ ও ধাতু-নির্ম্মিত নল, অম্ল, লবণ, ক্ষার ও বিষ—এই সকল দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া রসক্রিয়া আরম্ভ করিতে হইবে।

পারদ রঞ্জিত বা ভস্মীভূত করিতে হইলে যন্ত্রবিশেষ সহায়তা করে। ভৈষজ্য বা ঔষধের পরিবর্ত্তে কেবলমাত্র যন্ত্রের সাহায্যে পারদের মারণ-ক্রিয়া সম্পন্ন হইতে পারে। সুতরাং নিপুণ লোক যন্ত্রকে হতাদর করিবে না।

কৃষ্ণ, লোহিত মৃধা ও পীত ও শ্বেত মৃত্তিকা, তুষ, বল্মীক মৃত্তিকা, ছাগ ও অশ্বের বিষ্ঠাদগ্ধ, লৌহমল ইত্যাদি বিবিধ ভাগে মিশ্রিত করিয়া মৃধা বকযন্ত্র প্রভৃতি প্রস্তুত হয়।

অগ্নিশিখার বর্ণ

তাম্র নীলবর্ণ শিখা প্রদান করে; রঙ্গ কপোতবর্ণ; সীস অনুজ্জ্বল; লৌহ চর্ম্মাভ; ময়ূর প্রস্তর লোহিত বর্ণ শিখা প্রদান করে।

বিশুদ্ধ ধাতুর লক্ষণ

মুষাতে দ্রবীভূত হইলে যদি কোন স্ফুলিঙ্গ, বুদ্‌বুদ্‌, বিস্ফোটন বা কোন শব্দ না হয়, কিংবা উপরে কোন রেখা না দেখা দেয়, তাহা রত্নের ন্যায় স্থির থাকে, তাহা হইলে সেই ধাতু বিশুদ্ধ।

শিষ্য নির্ব্বাচন

গুরু বিজ্ঞ, অভিজ্ঞ, রসায়নশাস্ত্রবিদ্‌, শিবদুর্গার প্রতি ভক্তিমান্‌ ও স্থির হইবে। শিষ্য গুরুর প্রতি শ্রদ্ধাবান্‌, সুশীল, সত্যবাদী, কর্ম্মঠ, বাধ্য, অহঙ্কারশূন্য ও দৃঢ়বিশ্বাসী হইবে।

রসবিদ্যা শিবেনোক্তা দাতব্যা সাধকায় বৈ
যথোক্তেন বিধানেন গুরুণা মুদিতাত্মনা।

রসবিদ্যা স্বয়ং মহাদেব কর্ত্তৃক প্রচারিত হইয়াছে। লিখিত নিয়মানুসারে গুরু শিষ্যকে আনন্দিত হৃদয়ে শিক্ষা দিবেন।

রসশালা

যেখানে ভৈষজ্য ও কূপের অভাব নাই সেইরূপ স্থলে রসশালা নির্ম্মাণ করা উচিত। তথায় বিবিধ যন্ত্র সংগ্রহ করা আবশ্যক। রসলিঙ্গ পূর্ব্বদিকে স্থাপন করিয়া দক্ষিণ-পূর্ব্বে চুল্লী ও দক্ষিণে যন্ত্রাদি রাখিবে। ধাতুসার প্রস্তুতের নিমিত্ত কোষ্ঠিকযন্ত্র, জলপাত্র পশ্চিমে রাখিবে। ভস্ত্রা, বিবিধযন্ত্র, খল, উদূখল, নানা আকারের ছিদ্রযুক্ত চালুনী, মূষা প্রস্তুত করিবার মৃত্তিকা, অঙ্গার, ঘুঁটে, কাঁচনির্ম্মিত পাতনযন্ত্র, মৃত্তিকা ও লৌহ, শঙ্খ, লৌহকটাহ ইত্যাদি সংগ্রহ করিবে।

নমুনা স্বরূপ যে কয়টি উদাহরণ উল্লেখ করা গেল তাহাতেই বুঝা যায় প্রাচীন ভারতে সূক্ষ্ম পর্য্যবেক্ষণ ও অনুসন্ধিৎসা কি প্রকার বলবতী ছিল।

পরিশেষে মহাত্মা বেকনের যথার্থ উক্তির উল্লেখ করিয়াই উপসংহার করিব। "তবেই আমরা দেখিতেছি পাশবিক বলের কীর্ত্তিস্তম্ভ অপেক্ষা বিদ্যা ও বুদ্ধির কীর্ত্তিস্তম্ভ কত সুদৃঢ়। হোমারের কবিতার একটি পদ কিংবা একটি বর্ণ-পর্য্যন্ত বিলুপ্ত না হইয়াও কি ইহা পঞ্চবিংশ শতাব্দীর অধিক কাল পর্য্যন্ত প্রচলিত হয় নাই? ঐ সময়ের মধ্যে অসংখ্য প্রাসাদ, মন্দির, দুর্গ, নগর প্রভৃতি কি ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া বিলুপ্ত হয় নাই? সাইরাস,

সেকেন্দর, সিজার কিংবা অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময়ের নৃপতি বা বিশিষ্ট ব্যক্তির প্রতিকৃতি অথবা মূর্ত্তি থাকা সম্ভব নহে। কারণ প্রথমতঃ চিত্র চিরকাল থাকে না এবং প্রতিলিপি কিঞ্চিৎ বিকৃতি প্রাপ্ত হয়। কিন্তু মানবের বিদ্যাবুদ্ধির প্রতিকৃতি গ্রন্থে লিপিবদ্ধ থাকিয়া কালের গ্রাস হইতে রক্ষা পায় এবং চিরনবীনতা লাভে সমর্থ হয়।"

এই জন্যই সপ্ত, অষ্ট বা দশ শতাব্দী পরেও গোবিন্দ, সোমদেব, নাগার্জ্জুন, রামচন্দ্র, স্বচ্ছন্দভৈরব এবং অন্যান্য রসায়নশাস্ত্রবিদ্‌গণ ধূলিসমাচ্ছন্ন, কীটদষ্ট গ্রন্থ ও পুঁথি হইতে আগ্রহে আবেদন করিতেছেন যে, "হে বর্ত্তমান ভারতবাসিগণ, আমরা যে-বিজ্ঞান এত যত্নে চর্চ্চা করিয়াছিলাম তোমরা তাহা পরিত্যাগ করিও না।" সহস্র বৎসর পূর্ব্বে নাগার্জ্জুন যাহা বলিয়াছিলেন আমি সেই কথা বলি—"হে দেবী, দ্বাদশ বৎসর আমি আপনার মন্দিরে পূজা করিয়াছি। যদি আপনাকে তুষ্ট করিতে সমর্থ হইয়া থাকি তবে আপনার ভক্তের প্রতি সদয় হইয়া দুর্লভ রসবিদ্যা দান করুন।"

"দ্বাদশানি চ বর্ষাণি মহাক্লেশঃ কৃতো ময়া।

*　　*　　*　　*

যদি তুষ্টাসি মে দেবি সর্ব্বদা ভক্তবৎসলে।
দুর্লভং ত্রিষু লোকেষু রসবন্ধনং দদস্ব মে॥"

বহুশতাব্দী পূর্ব্বে আমাদের বিজ্ঞানশাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন হইতে হইলে যদি একাগ্রমনা ছাত্রের পক্ষে অন্ততঃ দ্বাদশ বর্ষ শিক্ষা করা কর্ত্তব্য বিবেচিত হইত, তবে এই সময়ে ঐ শাস্ত্রে পারদর্শী হইতে হইলে আরও কত বর্ষ অধ্যয়ন করা উচিত বল দেখি? বর্ত্তমান সময়ে রসায়ন-শাস্ত্র সকল বিজ্ঞানের মধ্যে বিপুল প্রসার লাভ করিয়াছে। ইহার চর্চ্চার দ্বারাই এখন জাতীয় অদৃষ্ট স্থিরীকৃত হয় এবং জর্ম্মানগণ সযত্নে ইহার চর্চ্চা করিয়া-ছিলেন বলিয়াই তাঁহারা জগতে রাষ্ট্রনৈতিক সোপানের শ্লাঘনীয় স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। কিন্তু কেবল জ্ঞানান্বেষণ-হেতু বিজ্ঞান অনুশীলন করা যায়, আবার কোন প্রকার দুরভিসন্ধির কার্য্যেও তাহাকে নিযুক্ত করা যায়। যিনি বিজ্ঞানের অনুশীলনে প্রকৃত লিপ্ত তিনি প্রকৃতির গুপ্ত তথ্য আবিষ্কৃত করিতে পারেন বলিয়া যথার্থ আনন্দ উপভোগ করেন। যদি মুহূর্ত্তের জন্যও আমি মিল্‌টনের তূর্য্যধ্বনির অধিকারী হইতাম, তাহা হইলে বলিতাম যে আমাদের জাতি নির্ব্বোধ নহে; পরন্তু তীক্ষ্ণ ধী-শক্তিসম্পন্ন, অপূর্ব্ব মানসিক বলে বলীয়ান, উদ্ভাবনে পটু, কূটতর্কে নিপুণ এবং মানবের শ্রেষ্ঠশক্তির সর্ব্বোচ্চ শিখর স্পর্শ করিতেও অক্ষম নহে। এই জন্য সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানের অধিকারিগণ আমাদের

মধ্যে এত প্রাচীন ও ব্যুৎপন্ন যে বুদ্ধিমান লেখকেরাও বলিতে বাধ্য হইয়াছেন যে পিথাগোরাসের মতাবলম্বীরা এই ভারতের প্রাচীন দর্শনশাস্ত্র হইতে ভাব গ্রহণ করিয়াছেন।

এই ত গেল অতীতের কথা—এখন একবার আলোচনা করিয়া দেখা যাউক কেন এই সহস্র বৎসর কাল ভারত নিবিড় তমসাচ্ছন্ন হইয়া রহিল—কেন বিজ্ঞানালোচনা একেবারে তিরোহিত হইল? কেন বিদ্যানুশীলন লোপ পাইল—কেন দীপ নির্ব্বাপিত হইল? সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস-বেত্তা বেবর আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন, ভাস্করাচার্য্য—যিনি খ্রীঃ অঃ ১১শ শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত হন—ভারতনভোমণ্ডলের শেষ তারকা। বলা বাহুল্য খ্রীঃ ৫ম ও ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে আর্য্যভট্ট, বরাহমিহির প্রভৃতি গণিত ও জ্যোতিষ শাস্ত্রের আলোচনা করেন। কেন বিজ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী পুণ্য ভারতভূমি পরিত্যাগ করিয়া পশ্চিম-অভিমুখী হইলেন?

ইহার পর হইতেই আরবজাতি সদর্পে বোগ্‌দাদ হইতে জয়পতাকা উড্ডীয়মান করিয়া আফ্রিকার উত্তর ভাগ উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক স্পেন জয় করিয়া তথায় সাম্রাজ্য স্থাপন করিলেন ও সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানালোক বিস্তার

করিতে থাকিলেন। এই প্রকারে গ্রানাডা, সেভিল, টোলিডো প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ে ন্যায়শাস্ত্র, মনোবিজ্ঞান, জ্যোতিষ, গণিত, পদার্থবিদ্যা ও রসায়নশাস্ত্র অধ্যাপনা হইতে লাগিল—ইউরোপের নানাদেশ হইতে—ইংলণ্ড, জার্ম্মানি, ফরাসী প্রভৃতি—সহস্রে সহস্রে যুবক আসিয়া জ্ঞানপিপাসা নিবৃত্তি করিতে লাগিল। খ্রীঃ ১৫শ শতাব্দীর শেষভাগে মুর জাতি স্পেন হইতে বিতাড়িত হইলেন বটে কিন্তু তাঁহারা যে দীপ জ্বালিয়াছিলেন তাহা আর নিবিল না—ঠিক সেই সময়ে কোপার্ণিকাস্ জন্মগ্রহণ করিলেন এবং পর পর ঠিক পৌর্ব্বাপর্য্য হিসাবে টাইকোব্রাহী, কেপ্‌লার, গ্যালিলিও ও নিউটন প্রভৃতি মনীষিগণ ইউরোপে বিজ্ঞানের নবযুগের অবতারণা করিলেন।

প্রায় ৬০ বৎসর হইল আমার জন্মস্থানের অতি সন্নিকটস্থ কপোতাক্ষতীরবাসী অমর কবি মর্ম্মবেদনায় গাহিয়াছিলেন—

"কোথায় বাল্মীকি ব্যাস কোথা তব কালিদাস
কোথা ভবভূতি মহোদয়।
অলীক কুনাট্যরঙ্গে মজে লোকে রাঢ়ে বঙ্গে,
নিরখিয়া প্রাণে নাহি সয়।"

আমিও খেদোক্তি করিতেছি—হায়! হায়! কোথায়

আজ আর্য্যভট্ট, ভাস্কর, ব্রহ্মগুপ্ত, বরাহমিহির, আর কোথায় বা সেই রাসায়নিকবৃন্দ—নাগার্জ্জুন, যশোধর, স্বচ্ছন্দভৈরব প্রভৃতি? আবার কি এই অভাগা দেশে সে প্রকার মানুষ জন্মিবে না? আমাদের জাতি যেন নিষ্প্রভ, অসার, জড়বৎ হইয়া রহিয়াছে। অনেকে বলেন, সুযোগের অভাব, কিন্তু আমার তাহাও ত মনে হয় না—১৮৩৫ খ্রীঃ কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ স্থাপিত হইয়াছে—এই ৮৪ বৎসর যাবৎ তথায় উদ্ভিদ্-প্রাণী-অস্থি-শারীর-বিদ্যা প্রভৃতি অধীত হইতেছে, কিন্তু কই এমন কাহাকেও দেখি না যিনি নূতন তত্ত্ব উদ্‌ঘাটন করিয়া জ্ঞানভাণ্ডার বৃদ্ধি করিয়াছেন। একবার ইউরোপের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করা যাউক। ফরাসী দেশের একজন ব্যবহারাজীব লিয়োনে সারাজীবন শুঁয়োপোকা প্রজাপতিত্বে পরিণত হইবার পূর্ব্বে কি প্রকারে দাঁত বসাইয়া কঠিন কাঠের ভিতর ছিদ্র করে এই প্রশ্নের মীমাংসায় ব্রতী ছিলেন। হুবর নামক একজন প্রাণীবেত্তা আজীবন মধুমক্ষিকার জীবনযাত্রা (life history) লইয়া ব্যস্ত ছিলেন। তিনি যৌবন কালেই অন্ধ হইয়া পড়েন। এই কারণে তিনি স্বচক্ষে পর্য্যবেক্ষণ করিতে অপারগ হইলেন। কিন্তু তাঁহার বিদুষী পতিব্রতা সহধর্ম্মিণী তাঁহার জন্য মৌমাছির আচার-

ব্যবহার, রীতিনীতি সমুদয় সযত্নে অধ্যয়ন করিতেন এবং তাঁহার স্বামী এই সমস্ত শুনিয়া লিপিবদ্ধ করিতেন। হুবর এই প্রকার একাগ্রতা ও অধ্যবসায় সহকারে এক বৃহদায়তন পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন এবং একজন অসামান্য মক্ষিকাচরিত-বেত্তা বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। জিয়োভার্ট নামক একজন দিনেমার চিত্রকর পতঙ্গজাতির অদ্ভুত জীবন-রহস্য অধ্যয়ন করিবার জন্য ২০ বৎসর যাবৎ তন্ময় ছিলেন। রাজারাজড়ার সভায় নিমন্ত্রিত হইলে তিনি এই বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিতেন, "আপনারা অকারণ নানা রঙের মহাঁমূল্য বেশভূষা করেন কেন? আপনাদের কি লজ্জা হয় না যে একটি অতি হেয় প্রজাপতিকে ঈশ্বর যে প্রকার সৌন্দর্য্যে বিভূষিত করিয়াছেন আপনারা তাহার শতাংশের এক অংশও নকল করিতে পারিবেন না।" কিন্তু আমাদের দেশের উকিল মহাশয়গণ তাস, পাশা, আডডা, খোশগল্প ও পরচর্চ্চা লইয়াই অধিক সময় যাপন করেন!

ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিকগণ কি প্রকার একনিষ্ঠ সাধক তাহার আরও একটি প্রমাণ দিতেছি। বিখ্যাত ক্যাভেণ্ডিশ কুবেরের ন্যায় ধনশালী ছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু তিনি ধনসম্পদ তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া পরীক্ষাগারে (Laboratory) আত্মহারা হইয়া

প্রকৃতির গূঢ় রহস্য উদ্‌ঘাটনে ব্যাপৃত থাকিতেন। ব্যাঙ্কে তাঁহার দেড়কোটী টাকা মজুত ছিল। এ ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দের কথা বলিতেছি; তখনকার হিসাবে দেড়কোটী টাকা আজকালকার অন্যূন সাত-আট কোটী টাকার তুল্য হইবে। ব্যাঙ্কের কর্ত্তা একদিন ক্যাভেণ্ডিশের নিকট আসিয়া সানুনয় নিবেদন করিলেন, "মহাশয়, এত অধিক টাকা শুধু পড়িয়া রহিয়াছে, যদি আদেশ করেন উহা নানা প্রকারে খাটাইয়া সুদ লাভ করিবার বন্দোবস্ত করি।" ক্যাভেণ্ডিশ একাগ্রচিত্তে পরীক্ষা করিতেছিলেন। একবার ব্যাঙ্ক-ম্যানেজারের প্রতি ভ্রূকুটী-কুটিল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "দূরমপসর।" কয়েক মাস পরে আর-একদিন ব্যাঙ্কের কর্ত্তৃপক্ষ এই বৈজ্ঞানিকের নিকট অনুরোধ করিলেন, "এত টাকা অকারণ ফেলে রাখা কি উচিত?" ক্যাভেণ্ডিশ বিরক্ত হইয়া উত্তর দিলেন, "যদি আমাকে পুনরায় বিরক্ত করেন তাহা হইলে ব্যাঙ্ক হইতে সমস্ত টাকা উঠাইয়া লইব।" প্রসিদ্ধ নিউটনের তন্ময়ত্ব বিষয়ে অনেক গল্প প্রচলিত আছে। তাহার একটি মাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে। তিনি যখন কোন গূঢ় ও জটিল রহস্য ভেদ করিবার জন্য অগ্রসর হইতেন তখন ঘণ্টার পর ঘণ্টা, এমন কি দিনের পর দিন, আত্মহারা হইয়া থাকিতেন। একদিন তাঁহার

এক বন্ধু তামাসা দেখিবার জন্য এই উপায় উদ্ভাবন করিলেন—নিউটনের দাসী খাবার রাখিয়া ঢাক্‌নী দিয়া চলিয়া যাইত; বন্ধুটি একদিন আসিয়া ছুরি-কাঁটা সহযোগে মুর্গীটি উদরস্থ করিয়া তাহার হাড়গোড় জমা করিয়া পুনরায় ঢাক্‌নী দিয়া চলিয়া গেলেন। কিছুকাল পরে নিউটনের ধ্যানভঙ্গ হইলে তাঁহার মনে পড়িল, মধ্যাহ্নের আহার করেন নাই, তখন তিনি খাইতে বসিয়া ঢাক্‌নী তুলিলেন, কিন্তু খাদ্যাবশিষ্ট কেবলমাত্র হাড় রহিয়াছে দেখিয়া মনে করিলেন, কখন খাইয়াছেন ভুলিয়া গিয়াছেন এবং লজ্জিত হইয়া তাড়াতাড়ি সেখান হইতে উঠিয়া গেলেন। ইহাকেই বলে একনিষ্ঠা ও একাগ্রতা। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে প্রায় সহস্র বৎসর পূর্ব্বে এক ভারতীয় রাসায়নিক বলিয়াছিলেন, অন্যূন বার বৎসর কাল এই বিদ্যার একাগ্রতার সহিত চর্চ্চা না করিলে প্রতিষ্ঠালাভ করা যায় না। এখন এক ধূয়া উঠিয়াছে—এমন কি এক বাঁধিগৎ শুনা যায় যে আমাদের এ-সব করিবার দরকার নাই, হাত-পা গুটাইয়া চুপ করিয়া থাকিলেই চলিবে, যে-হেতু আমরা আধ্যাত্মিকতায় পরিপূর্ণ—এসব ইউরোপেই সাজে, কারণ তাহারা সম্পূর্ণ জড়বাদী (materialistic)। যে-সমস্ত মহাপুরুষের জ্ঞান-পিপাসার কথা উল্লেখ করিলাম

তাঁহাদের তন্ময়ত্ব ও একাগ্রচিত্ততার ভিতর কতদূর অর্থকরী তৃষ্ণা ছিল তাহা আপনারা বিচার করুন।

আমাদের লেখাপড়া, মনে হয় যেন মা সরস্বতীর সঙ্গে ফাঁকিজুকি বা লুকোচুরি খেলা। কোন রকমে বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ছাপ পাইলেই হইল। যাহা হউক, আর অবসাদ ও নিরাশার কাহিনী বিবৃত করিয়া আপনাদের মহামূল্য সময়ের অপচয় করিব না—বিশেষতঃ আমার সমক্ষে যুবকবৃন্দকে দেখিতেছি—যাঁহারা দেশের ভাবী আশাস্থল—তাঁহাদের উৎসাহ-অনলের উপর শীতল বারি প্রক্ষেপ করিব না—বরং দেখিতেছি অমানিশার অবসান হইয়াছে—পূর্ব্বদিকে অরুণের রক্তাভ রেখা উঠিতেছে—ভারত-সন্তানগণের প্রতিভার উন্মেষ হইতেছে. তাঁহারা কিছু কিছু মৌলিক গবেষণার পরিচয় দিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

বিনা কারণে আমাদের এই পুণ্যভূমি বাল্মীকি ও ব্যাস, কালিদাস ও ভবভূতি, শঙ্করাচার্য্য ও রামানুজ, নাগার্জ্জুন ও যশোধর, বরাহমিহির ও ভাস্কর, এবং আধুনিক সময়ের রামমোহন, কেশবচন্দ্র ও বিবেকানন্দের জন্মভূমি বলিয়া ভগবান কর্ত্তৃক অনুগৃহীত হয় নাই। হে ভারতের বর্ত্তমান বংশধরগণ! আশা করি তোমরাও তোমাদের নির্দ্দিষ্ট কার্য্য সাধন করিতে পরাঙ্মুখ হইবে

না। যশঃসৌরভে আমোদিত অতীত যুগের ন্যায় ভবিষ্যতেও আমাদের এই প্রিয় জন্মভূমি উন্নতমস্তকে জগৎসভায় একটু সম্মানের আসন পাইবার যোগ্য বিবেচিত হইবে কি না তাহা তোমাদের উপরই সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে।

আমাদের প্রকাশিত

সোনার বাংলা গ্রন্থমালা

*

বীর-চরিত গ্রন্থমালা

*

বিশ্বভারত গ্রন্থমালা

সম্বন্ধে

দুইটি অভিমত

"......দেশের শিশুমঙ্গল সাহিত্যে নবযুগ আনিয়াছেন... 'সোনার বাংলা গ্রন্থমালা', 'বীর-চরিত গ্রন্থমালা', 'বিশ্বভারত গ্রন্থমালা' প্রভৃতিতে ছেলেদের জন্য আনন্দ-রসের সদাব্রত খুলিয়াছেন।"—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা-ভাষার ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক ও সুপ্রসিদ্ধ সমালোচক কবিবর শশাঙ্কমোহন সেন।

"......ছোট ছেলেদের মনোরঞ্জন করিতে পারিবে...অভিনব ও প্রশংসনীয়। সম্পাদনে যত্ন ও কৃতিত্ব আছে।...বরদা এজেন্সীর প্রচেষ্টা সফল হইতেছে।"—প্রবাসী।

তালিকার জন্য পত্র লিখুন

বরদা এজেন্সী—কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা।